প্রবন্ধ

শব্দতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- বাংলা উচ্চারণ 3
- স্বরবর্ণ অ 9
- স্বরবর্ণ এ 11
- টা টো টে 15
- বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ 18
- বাংলা বহুবচন 27
- বাংলা শব্দদ্বৈত 40
- ধ্বন্যাত্মক শব্দ 43
- বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত 52
- ভাষার ইঙ্গিত 67
- একটি প্রশ্ন 82
- সংজ্ঞাবিচার 84
- হুজুগ 86
- আহ্লাদে 90
- ‘ নিছনি’ 92
- ‘ পহুঁ’ 96

- প্রত্যুত্তর 99
- ভাষাবিচ্ছেদ 105
- উপসর্গ- সমালোচনা 110
- প্রাকৃত ও সংস্কৃত 123
- বাংলা ব্যাকরণ 124
- বিবিধ 140
- বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা 146

বাংলা উচ্চারণ

ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙালির ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরেজি অক্ষরের নাম একরকম, তাহার কাজ আর-এক রকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে u-কে বলিব ইউ, কিন্তু up-এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোনো পুরুষে ইউ নন। ও পিসি এ দিকে এসো, এই শব্দগুলো ইংরেজিতে লিখিতে হইলে উচিতমত লেখা উচিত—O pc adk so। পিসি যদি বলেন এসেচি, তবে লেখো—She; আর পিসি যদি বলেন এইচি, তবে আরো সংক্ষেপ—he। কিন্তু কোনো ইংরেজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোনো বালাই নাই; তাহাদের কথার নড়চড় হয় না।

এই তো গেল প্রথম নম্বর। তার পরে আবার এক অক্ষরের পাঁচ রকম উচ্চারণ। অনেক কষ্টে যখন বি এ = বে, সি এ=কে মুখস্‌থ হইয়াছে, তখন শুনা গেল, বি এ বি = ব্যাব্, সি এ বি = ক্যাব্। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি বি এ আর = বার্, সি এ আর = কার্। তাও যদি বা আয়ত্ত হইল তখন শুনি, বি এ ডব্‌ল্-এল্ = বল্, সি এ ডব্‌ল্-এল্ = কল্। এই অকূল বানান-পাথরের মধ্যে গুরুমহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন,তাঁর কম্পাসই বা কোথায়, তাঁহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়।

আবার এক-এক জায়গায় অক্ষর আছে অথচ তাহার উচ্চারণ নাই; একটা কেন, এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে, বাঙালির ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আরেকোনো সাধু উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। মাস্টারমশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি। পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজস্বরূপে থাকে মাত্র। বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ম সঙিন

ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—গবর্নমেণ্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।

ইংরেজের কামান আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কী কম। ইহারা আমাদের ছেলেদের পাকযন্ত্রের মধ্যে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। ইংরেজের প্রজা বশীভূত করিবার এমন উপায় অতি অল্পই আছে। বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়; আমাদের বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি, উদরের পরিপাকশক্তি বিদায়গ্রহণ করে; তার পরে ম্যালেরিয়াকম্পিত হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরেজ-রাজ্যের সর্বত্র আছে (রক্ষা হউক আর না-ই হউক), কিন্তু ইংরেজের ফার্স্টবুক-এ নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত—কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরেজি ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক, সে বিষয়ে কাহারো দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সংগত হয়; ইহাতে আজকালকার বাঙালির ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে :

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
ফাস্টবুক এল দেশে-
বানান ভুলে মাথা খেয়েছে
এগজামিন দেবো কিসে।

পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন, ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, “দেখো বাপু, ‘সুশীতল সমীরণ’ লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো ‘ঠাণ্ডা হাওয়া’।” এ ছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ৯ঙঞ-গুলো কেবল সঙ সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্-না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গি আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের একার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দে প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শ্‌শ-এর ন্যায়। ‘ব্যয়’ লিখি কিন্তু পড়ি—ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্ধোব। লিখি ‘সহ্য’, পড়ি-সোজ্‌ঝো। এমন কত লিখিব।

আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণের কোনো তফাত নাই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়; কিন্তু আমাদের যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো কষ্ট শব্দ এবং ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ, দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। ‘আসতে হবে’ এবং ‘আশ্চর্য’ এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হইয়াছে। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজি z-এর মতো হয়, যেমন লুচি ভাজতে হবে, এ স্থলে ভাজতে শব্দের জ ইংরেজি z-এর মতো।

সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তস্থ ব-এর আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান শব্দে অন্ত্যস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

আমরা লিখি ‘তাঁহারা’ কিন্তু উচ্চারণ করি—তাহাঁরা অথবা তাঁহাঁরা। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলাভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খানদুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই-সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকালবেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি—গোটাদশেক হলদে রঙ-করা মস্ত

খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সর মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজপত্র কোথায়। কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড়চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি,তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনই একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে, তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

কিছু কিছু মনে আছে, তাহা লিখিতেছি। অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারারান্ত হইয়া যায়। যেমন:

অতি কলু ঘড়ি কল্য মরু দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব-ও বলিলেও হয়।

দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থানবিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়। ১ম নিয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে। যথা, অগ্নি অগ্রিম কপি তরু অঞ্জুলি অধুনা হনু ইত্যাদি।

২য়। যফলা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ যফলা ই এবং অ-এর যোগমাত্র। উদাহরণ, গণ্য দন্ত্য লভ্য ইত্যাদি। 'দন্ত' এবং 'দন্ত্য ন' এই দুই শব্দের উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া দেখো।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায়; যথা, অক্ষর কক্ষ লক্ষ পক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করিয়া উচ্চারণ করেন, এমনকি, ক্ষ-র পূর্বেও ঈষৎ ইকারের আভাস দেন। কলিকাতা অঞ্চলে 'লক্ষ টাকা' বলে, তাঁহারা বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা'।

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ ‘ও’ হইয়া যায়; যেমন, হ’লে ক’রলে প’ল ম’ল ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি কোনো স্থলে অ-এর পরবর্তী ই অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে, তথাপিও পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও হইবে। হইলে-র অপভ্রংশ হ’লে, করিলে-র অপভ্রংশ কর্‌লে, পড়িল—পল, মরিল—মল। করিয়া-র অপভ্রংশ ক’রে, এইজন্য ক-এ ওকার যোগ হয়, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া ‘করে’ অবিকৃত থাকে। কারণ করে শব্দের মধ্যে ই নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার ‘ও’ হয়; যথা, কর্তৃক ভর্তৃ মসৃণ যকৃত বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষায় ঋফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ঠ। এবারে যে-নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর-বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধন্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার ‘ও’ হইয়া যায়; যথা, বন ধন জন মন মণ পণ ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন ‘ঘনো দুধ’, কেহ বলেন ‘ঘোনো দুধ’। কেবল গণ এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশি অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না; যেমন, কনক গণক সন্‌সন্‌ কন্‌কন্‌। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে, সেখানেও এ নিয়ম খাটে না; যেমন, কহেন শব্দের অপভ্রংশ ক’ন, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ হন ইত্যাদি। যাহা হউক ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ ‘ও’ হইয়াছে। অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে; যথা, হউন—হ’ন, রহুন—র’ন, কহুন—ক’ন ইত্যাদি।

৮ম। রফলা-বিশিষ্ট বর্ণের সহিত অ লিপ্ত থাকিলে তাহা ‘ও’ হইয়া যায়; যথা, শ্রবণ ভ্রম ভ্রমণ ব্রজ গ্রহ ত্রস্ত প্রমাণ প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু য় পরে থাকিলে অ-এর বিকার হয় না; যথা ক্রয় ত্রয় শ্রয়।

দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ ‘ও’ হইয়া যায়। এমন-কি, ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ নিয়ম খাটে। এমন-কি, যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্বেও অ-এর বিকার হয়। ইকারের পক্ষে যেমন যফলা, উকারের পক্ষে তেমনই বফলা—উ-এ অ-এ মিলিয়া বফলা

হয়; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে বফলার পূর্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই-তিনটি মনে আসিতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর।

এইখানে গুটিকতক ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই উ যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না; যথা, অকিঞ্চন অকুতোভয় অখ্যাতি অনৃত অক্ষয়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানে না, অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্তী অ 'ও' হইয়া যায়; মন্দ মন্ত্র মন্ত্রণা নখ মঙ্গল ব্রহ্ম।

আমি এই প্রবন্ধে কেবল আদ্যক্ষরবর্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম লিখিলাম। মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই। মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। বল শব্দে ব-এর সহিত সংযুক্ত অকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কেবল শব্দের ব-এ হ্রস্ব ওকার লাগে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়মও সময়াভাবে বাহির করিতে পারি নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোনো অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমত অন্বেষণ করিয়া এই-সকল নিয়ম নির্ধারণ করিতে পারেন, তবে আমাদের বাংলা ব্যাকরণের একটি অভাব দূর হইয়া যায়।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

বাংলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

স্বরবর্ণ অ

বাংলা শব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহারই অনুবৃত্তিক্রমে আরো কিছু বলিবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎপরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জনা করিতে হইবে।

বাংলায় প্রধানত ই এবং উ এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে, গত শব্দের গ-এ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-এ ও-কার সংযোগ হইয়াছে। কণা এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখো।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্তী বর্ণে যফলা থাকিলে পূর্ববর্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলত যফলা— ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। ১

ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার ‘ও’ হয়। এ সম্বন্ধে কর্তা এবং কর্তৃ, ভর্তা এবং ভর্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনাস্থলে আনা যায়। কিন্তু বাংলায় ঋফলা উচ্চারণে ইকার যোগ করা হয়, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না। ২ অপভ্রংশে পরবর্তী ই অথবা উ লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে; যেমন হইল শব্দের অপভ্রংশে হ’ল, হউন শব্দের অপভ্রংশে হ’ন [কিন্তু, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ ‘হন’ উচ্চারণ হয়]। থলিয়া শব্দের অপভ্রংশে থলে, টকুয়া শব্দের অপভ্রংশে ট’কো (অম্ল)।

ক্ষ-র পূর্বেও অ ও হইয়া যায়; যেমন, কক্ষ পক্ষ লক্ষ। ক্ষ-শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনো পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করেন; এবং তাঁহাদের দেশের যফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন; যেমন,তাঁহারা লক্ষটাকা-কে বলেন—লৈক্ষ্য টাকা।

যাহা হউক, মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে, পূর্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ, সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে; যেমন, অ এবং উ-র মধ্যপথে—ও, অ এবং ই-র সেতুস্বরূপ—এ; যখন এক পক্ষে ই অথবা এ এবং অপর পক্ষে আ, তখন অ্যা তাহাদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন করে। বোধ হয় ভালো করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বাঙালিরা উচ্চারণকালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

১. যফলা যেমন ই এবং অ-র সংযোগ, বফলা তেমনই উ এবং অ-র সংযোগ, অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্বনিয়ম খাটে। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে-দুয়েকটি মনে পড়িতেছে তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরি মন্বন্তর। কজ্জ্বল সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং বফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

২. মহারাষ্ট্রীয়েরা ঋ উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতি-কে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন। প্রক্রুতি।

স্বরবর্ণ এ

বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুই প্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর-একটি অ্যা। এক এবং একুশ শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়; কেবল এ সম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।—পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ববর্তী একারের কখনোই বিকৃতি হয় না। জেঠা এবং জেঠী, বেটা এবং বেটী, একা এবং একটু—তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে; অনেক স্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে; যথা, তেলা (তৈলাক্ত) এবং বেলা (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ববর্তী একারের কিরূপ অবস্থা হয়। অধিকাংশ স্থলেই কোনো পরিবর্তন হয় না; যথা, কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য ন-এর পূর্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; যথা, ফেন (ভাতের) সেন (পদবী) কেন যেন হেন। মূর্ধণ্য ণ-এর পূর্বেও সম্ভবত এই নিয়ম খাটে, কিন্তু প্রচলিত বাংলায় তাহার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ দিনক্ষণ-কে দিনখ্যান বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি, ন অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে,অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে—বন মন ধন জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট মঠ জল প্রভৃতি শব্দর প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস,পরবর্তী চ অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে—প্যাঁচ। কিন্তু সেটা যে পেঁচ-শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে, এমন অনুমান করিবার কোনো কারণ নাই। আর-একটা বলা যায়—'ঢ্যাঁচ'। 'ঢ্যাঁচ' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু

পশ্চিমবঙ্গাবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, চ-এর পূর্বে বিশুদ্ধ এ-কার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এখানে বলা আবশ্যক, আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছে।

পূর্বনিয়মের দুটো-একটা ব্যতিক্রম আছে। কোনো পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন তো সুখী হইব। এ দিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে 'এ' স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর-একটা ব্যতিক্রম—লেজ (লাঙ্গুল)। তেজ শব্দের একার বিশুদ্ধ, লেজ শব্দের একার বিকৃত।

বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দাদ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে :

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ; যথা, বড়ো-বড়ো ছোটো-ছোটো বাঁকা-বাঁকা নেচে-নেচে গেয়ে-গেয়ে হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণ মূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাঁট প্যাঁট টাঁটাঁ খিটখিট ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না।

গাঁগাঁ গোঁগোঁ চীঁচীঁ চ্যাঁচ্যাঁ টুকটুক পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংস্রব পাওয়া যায়, যথা ঘেউঘেউ। এরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি; যথা, ফ্যাঁসফ্যাঁস খ্যাঁকখ্যাঁক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা,স্যাঁৎসেঁতে ম্যাড়মেড়ে। তাহার কারণ পূর্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁতস্যাঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্বে 'এ' উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখো, খেলা এবং গেলা (গলাধঃকরণ), ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম—সংস্কৃত মূলশব্দের ইকারের অপভ্রংশ বাংলার যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা,—এইজন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল; যেমন, মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচা) সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা) চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, চ অক্ষরের পূর্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এইজন্যই চ-এর পূর্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না। সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংস্রব পাওয়া যায়, যথা ঘেউঘেউ। এরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি; যথা, ফ্যাঁসফ্যাঁস খ্যাঁকখ্যাঁক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্তে একার সংযুক্ত হয়; যথা,স্যাঁৎসেঁতে ম্যাড়মেড়ে। তাহার কারণ পূর্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁতস্যাঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্বে 'এ' উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখো, খেলা এবং গেলা (গলাধঃকরণ), ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম—সংস্কৃত মূলশব্দের ইকারের অপভ্রংশ বাংলার যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা,—এইজন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরো অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল; যেমন, মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচা) সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা) চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, চ অক্ষরের পূর্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এইজন্যই চ-এর পূর্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে-যে-সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকারূপে যে-সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে। যথা :

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে বিশেষ্যরূপে

কিনিয়া কেনা বেচিয়া ব্যাচা

মিলিয়া মেলা
ঠেলিয়া ঠ্যালা
লিখিয়া লেখা
দেখিয়া দ্যাখা
হেলিয়া হ্যালা
গিলিয়া গেলা

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এইজন্য আমাদের অঞ্চলে আ কারের পূর্ববর্তী একার প্রায়ই অ্যা নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

টা টো টে

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির এরূপ তিন প্রকার ভেদ কেন হয়, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাংলা-শব্দে যে-সকল উচ্চারণবৈষম্য আছে, মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায়, এ কথা আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাংলায় আদ্যক্ষরবর্তী অ স্বরবর্ণ কখনো কখনো বিকৃত হইয়া 'ও' হইয়া যায়; যেমন, কলু (কোলু) কলি (কোলি) ইত্যাদি; স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায়; যেমন, খেলা (খ্যালা) দেখা (দ্যাখা) ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন গুটিকতক নিয়মের অনুবর্তী।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ই এবং উ স্বরবর্ণ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণবিকারের মূলীভূত কারণ; উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। 'সে' অথবা 'এ' শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে; যেমন, সেটা এটা। কিন্তু 'সেই' অথবা 'এই' শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে; যেমন, এইটে সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর টা টে হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সংগত হয় না। ইকারের পরবর্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়মপ্রয়োগ করিয়া দেখা কর্তব্য।

হইয়া—হয়ে হিসাব—হিসেব
লইয়া—লয়ে মাহিনা—মাইনে
পিঠা—পিঠে ভিক্ষা—ভিক্ষে
চিঁড়া—চিঁড়ে শিক্ষা—শিক্ষে
শিকা—শিকে নিন্দা—নিন্দে
বিলাত—বিলেত বিনা—বিনে

এমন-কি, যেখানে অপভ্রংশে মূলশব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায়, সেখানেও এ নিয়ম খাটে। যেমন :

করিয়া—ক’রে
মরিচা—মর্চে
সরিষা—সর্ষে

আ এবং ই মিলিত হইয়া যুক্তস্বর ‘ঐ’ হয়। এজন্য ‘ঐ’ স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায়; যেমন :

কৈলাস—কৈলেস
তৈয়ার—তোয়ের

শুধু কেবল ইহাই নহে। যফলার সহিত সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, যফলা ই এবং অ-এর যুক্তস্বর; যথা :

অভ্যাস—অভ্যেস
কন্যা—কন্যে
বন্যা—বন্যে
হত্যা—হত্যে

আমরা অ স্বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষ-র পূর্ববর্তী অকার ‘ও’ হইয়া যায়; যেমন, লক্ষ (লোক্ষ) পক্ষ (পোক্ষ) ইত্যাদি। যে-কারণবশত ক্ষ-র পূর্ববর্তী অ ওকারে পরিণত হয়, সেই কারণেই ক্ষসংযুক্ত আকার এ হইয়া যায়; যথা, রক্ষা—রক্ষে। বাংলায় ক্ষা-অন্ত শব্দের উদাহরণ অধিক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

যফলা এবং ক্ষ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। যফলা ও ক্ষ-সংযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আদ্যক্ষরে এ নিয়ম খাটে না; যেমন, ত্যাগ ন্যায় ক্ষার ক্ষালন ইত্যাদি।

বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে ছিল, করিলা খাইলা করিতা খাইতা করিবা খাইবা; এখন হইয়াছে, করিলে খাইলে করিতে খাইতে করিবে খাইবে। পূর্ববতী ইকারের প্রভাবেই যে আ স্বরবর্ণের ক্রমশ এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্বে ই থাকিলে যেমন পরবর্তী আ ‘এ’ হইয়া যায় তেমনই পূর্বে উ থাকিলে পরবর্তী আ ‘ও’ হইয়া যায়, এইরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে; যথা :

ফুটা—ফুটো
মুঠা—মুঠো

কুলা—কুলো
চুলা—চুলো
কুয়া—কুয়ো
চুমা—চুমো

ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ ঔ—অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর; যথা:

নৌকা—নৌকো
কৌটা—কৌটো

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার দুই-একটা উচ্চারণবিকার এমনই দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হউক তাহার অন্যথা দেখা যায় না; যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ববর্তী অ-কে আমরা সর্বত্রই 'ও' উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে-সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠা-কে মুঠো বলি, তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি; চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ভুল করা মানবধর্ম, বিশেষত বাঙালির পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ভুল করা। সেই প্রবাদের বাকি অংশে বলে, মার্জনা করা দেবধর্ম। কিন্তু বাঙালির ইংরেজি-ভুলে ইংরেজরা সাধারণত দেবত্ব প্রকাশ করেন না।

আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে-বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজিভাষার ঠিক মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারে, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এ দেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন,তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। ইংরেজগণ তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন।

সেইজন্য আমাদেরও বড়ো ইচ্ছা করে, যে-সকল ইংরেজ এ দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া, দেশীভাষা শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সুযোগ পাইয়াও সে-ভাষা সম্বন্ধে ভুল করেন তাঁহাদের প্রতি হাস্যরস বর্ষণ করিয়া পালটা জবাবে গায়ের ঝাল মিটাই।

সন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে দুই-একটা বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বাবু-ইংরেজির আদর্শ প্রায় অশিক্ষিত দরিদ্র উমেদারদিগের দরখাস্ত হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সহিত বাংলার ভূতপূর্ব সিবিলিয়ান জন্‌ বীম্‌স্‌ সাহেবের তুলনা হয় না। বীম্‌স্‌ সাহেব চেষ্টা করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন; বাংলাদেশেই তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়বয়স যাপন করিয়াছেন; বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালি সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালি মোক্তারের আবেদন শুনিয়াছেন এবং বাঙালি সাহিত্যেরও রীতিমত চর্চা করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায়।

কেবল তাহাই নয়, বীম্‌স্‌ সাহেব বাংলাভাষার এক ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ রচনা স্পর্ধার বিষয়; পেটের দায়ে দরখাস্ত রচনার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব সেই ব্যাকরণে যদি পদে পদে এমন সকল ভুল দেখা যায়, যাহা বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত অসংগত ঠেকে, তবে সেই সাহেবি অজ্ঞাতকে পরিহাস করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলা-ব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা-ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলাভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসংকুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দুটোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।

বীম্‌স্‌ সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে-সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। অতিপরিচয়-বশত ভাষার যে-সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর এবং দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়।

এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজি মুদ্রিত সাহিত্যে অনেক স্থলে বানানের সহিত উচ্চারণের সংগতি নাই। ইংরেজ লেখে একরূপ, পড়ে অন্যরূপ। বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।

এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজি মুদ্রিত সাহিত্যে অনেক স্থলে বানানের সহিত উচ্চারণের সংগতি নাই। ইংরেজ লেখে একরূপ, পড়ে অন্যরূপ। বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।

ব্যয় শব্দের ব্য, অব্যয় শব্দের ব্য এবং ব্যতীত শব্দের ব্য উচ্চারণে প্রভেদ আছে; লেখা এবং খেলা শব্দের এ কারের উচ্চারণ ভিন্নরূপ। সস্তা শব্দের দুই দন্ত্য স-এর উচ্চারণ এক নহে। শব্দ শব্দের শ-অক্ষরবর্তী অকার এবং দ-অক্ষরবর্তী অকারে প্রভেদ আছে। এমন বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এই উচ্চারণবিকারগুলি অনেক স্থলেই নিয়মবদ্ধ, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

বীম্‌স্‌ বলিতেছেন, বাংলা স্বরবর্ণ অ কোথাও বা ইংরেজি not rock প্রভৃতি শব্দের স্বরের মতো, কোথাও বা bone শব্দের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

স্থানভেদে অ স্বরের এইরূপ বিভিন্নতা বীম্‌স্‌ সাহেবের স্বদেশীয়গণ ধরিতে না পারিয়া বাংলা উচ্চারণকে অদ্ভুত করিয়া তোলেন। বাঙালি গরু-কে গোরু উচ্চারণ করেন, ইংরেজ তাহাকে যথাপঠিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোনো বাংলা ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম লিখিত থাকিত যে, ইকার, উকার, ক্ষ এবং ণ ও ন-র পূর্বে প্রায় সর্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ প্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।

কিন্তু এই-সকল নিয়মের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতা আছে। আমরা বন মন ক্ষণ প্রভৃতি শব্দকে বোন মোন খোন রূপে উচ্চারণ করি, কিন্তু তিন অক্ষরের শব্দের বেলায় তাহার বিপর্যয় দেখা যায়; তনয় জনম ক্ষণেক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

আশা করি, বাংলার এই-সকল উচ্চারণের বৈচিত্র্য ও তাহার নিয়মনির্ণয়কে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তুচ্ছজ্ঞান করিবেন না।

বীম্‌স্‌ সাহেব লিখিতেছেন, সিলেব্‌লের (syllable) শেষে অ স্বরের লোপ হইয়া হসন্ত হয়। কলসী ও ঘটকী শব্দ তিনি তাহার উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিত এবং কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে। বীম্‌সের ব্যাকরণে কোথাও বা লিখিত বাংলার কোথাও বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সাধুভাষায় লিখিত সাহিত্যে আমরা ঘটকী শব্দের ট হইতে অকার লোপ করি না। অপর পক্ষে বীম্‌স্‌ সাহেব যে-নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কী কথিত কী লিখিত কোনো বাংলাতেই সর্বত্র খাটে না; জনরব বনবাস বলবান পরচর্চা প্রভৃতি শব্দ তাহার উদাহরণ। এ স্থলে প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এ সংযুক্ত অকারের লোপ হয় নাই; অথচ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, জন বন বল এবং পর শব্দের শেষ অকার লুপ্ত হইয়া থাকে। কলস দুই সিলেব্‌লে গঠিত, কল + অস্‌, কিন্তু প্রথম সিলেব্‌লের পরবর্তী অকারের লোপ হয় নাই। ঘটক শব্দের দুই সিলেব্‌ল্‌, ঘট্‌+ অক্‌ , এখানেও অকার উচ্চারিত হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়মকে আর-একটু সংকীর্ণ করিয়া আনিলেই তাহার সার্থকতা পাওয়া যাইতে পারে।

আঁচল এবং আঁচ্‌লা, আপন এবং আপ্‌নি, চামচ এবং চাম্‌চে, আঁচড় এবং আঁচ্‌ড়ানো, ঢোলক এবং ঢল্‌কো, পরশ এবং পর্‌শু, দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী সিলেব্‌ল্‌ স্বরান্ত হইলে পূর্ব সিলেব্‌লের অকার লোপ পায়, পরন্তু হসন্তের পূর্ববর্তী অকার কিছুতেই লোপ পায় না।

কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত বনবাস, জনরব বলবান প্রভৃতি শব্দে এ নিয়ম খাটে নাই। তাহাতে অকার ও আকারের পূর্ববর্তী অ লোপ পায় নাই।

অথচ, পর্কনলা আল্‌পনা অব্‌সর (লিখিত ভাষায় নহে) প্রভৃতি প্রচলিত কথায় বীম্‌কসের নিয়ম খাটে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনো রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠ্‌শালা' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভূষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলাভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, বিশেষণ শব্দে সিলেব্‌িলের অন্তবর্তী অকারের লোপ হয় না; যথা, ভাল ছোট বড়।

রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন:

গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয় যেমন ছোট খাট; এতদ্‌ভিন্ন তাবৎ অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্‌ পট্‌ রাম্‌ রাম্‌দাস্‌ উত্তম্‌ সুন্দর্‌ ইত্যাদি।

রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, তথাপি খাঁটি বাংলা শব্দেও ব্যতিক্রম মিলিবে; যথা, নরম গরম।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে।

প্রথমেই মনে হয়, বিশেষণ শব্দ বিশেষরূপে অকারন্ত উচ্চারিত হইবে, এ নিয়মের কোনো সার্থকতা নাই। অতএব, ছোট বড় ভাল প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ যে সাধারণ বাংলা শব্দের ন্যায় হসন্ত হয় নাই, তাহার কারণটা ঐ শব্দগুলির মূল সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যাইবে। 'ভালো' শব্দ

ভদ্র শব্দজ, ‘বড়ো’ বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, ‘ছোটো’ ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত—যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে হসন্ত বর্ণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। নৃত্য-র অপভ্রংশ নাচ, পঙ্ক—পাঁক, অঙ্ক—আঁক, রঙ্গ—রাং, ভট্ট—ভাট, হস্ত-হাত, পঞ্চ—পাঁচ ইত্যাদি।

অতএব নিশ্চয়ই বিশেষণের কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব আরো চোখে পড়ে যখন দেখা যায়, বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ, যাহা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা আকারান্ত হইয়াছে।

যথা : সহজ—সোজা, মহৎ—মোটা, রুগ্ন—রোগা, ভগ্ন—ভাঙা, শ্বেত—শাদা, অভিষিক্ত—ভিজা, খঞ্জ-খোঁড়া, কাণ—কাণা, লম্ব—লম্বা, সুগন্ধ—সোঁধা, বক্র—বাঁকা, তিক্ত—তিতা, মিষ্ট—মিঠা, নগ্ন—নাগা, তির্যক্—টেড়া, কঠিন—কড়া।

দ্রষ্টব্য এই যে, ‘কর্ণ’ হইতে বিশেষ্য শব্দ কান হইয়াছে, অথচ কান শব্দ হইতে বিশেষণ শব্দ কানা হইল। বিশেষ্য শব্দ হইল ফাঁক, বিশেষণ হইল ফাঁকা; বাঁক শব্দ বিশেষ্য, বাঁকা শব্দ বিশেষণ।

সংস্কৃত ভাষায় ক্ত প্রত্যয়যোগে যে-সকল বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, বাংলায় তাহা প্রায়ই আকারান্ত বিশেষণ পদে পরিণত হয়; ছিন্নবস্ত্র বাংলায়—ছেঁড়া বস্ত্র, ধূলিলিপ্ত শব্দ বাংলায়—ধুলোলেপা, কর্ণকর্তিত-কানকাটা ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বন্ধ হইতে বাঁধ, কিন্তু বিশেষণ শব্দ মন্দ হইতে হইল—মাদা। এক শব্দকে বিশেষরূপে বিশেষণে পরিণত করিলে ‘একা’ হয়।

এইরূপ বাংলা দুই-অক্ষরের বিশেষণ অধিকাংশই আকারান্ত। যেগুলি অকারান্ত হিন্দিতে সেগুলিও আকারান্ত; যথা, ছোটা বড়া ভালা।

ইহার একটা কারণ আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। স্বর্গগত উমেশচন্দ্র বটব্যালের রচনা হইতে দীনেশবাবু তাঁহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থ নিম্নলিখিত ছত্রকয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

> তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ক-এর ব্যবহার কিছু বেশি। দূত স্থানে দূতক, হট্ট স্থানে হট্টিকা, বাট স্থানে বাটক, লিখিত স্থানে লিখিতক, এরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়। ... সমুদায় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন :

এই ক (যথা, বৃক্ষক চারুদত্তক পুত্রক) প্রাকৃতে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। গাথা ভাষায় এই ক-এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক; যথা ললিতবিস্তর, একবিংশাধ্যায়ে :

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো
বসবর্ত্তী সুলক্ষণবিচিত্রিতকো। ১॥
বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেব নরাণবসন্তুতিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্ত্তয় মানসকম্। ২॥

দীনেশবাবু প্রাচীন বাংলায় এই ক প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

এই ক-এর অপভ্রংশে আকার হয়; যেমন ঘোটক হইতে ঘোড়া, ক্ষুদ্রক হইতে ছোঁড়া, তিলক হইতে টিকা, মধুক হইতে মহুয়া, নাবিক হইতে নাইয়া, মস্তক হইতে মাথা, পিষ্টক হইতে পিঠা, শীষক হইতে শীষা,একক হইতে একা, চতুষ্ক হইতে চৌকা, ফলক হইতে ফলা, হীরক হইতে হীরা। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, লোহক হইতে লোহা,স্বর্ণক হইতে সোনা, কাংস্যক হইতে কাঁসা, তাম্রক হইতে তামা হইয়াছে।

আমরা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচকভাবে রাম-কে রামা, শ্যাম-কে শ্যামা, মধু-কে মোধো (অর্থাৎ মধুয়া), হরি-কে হরে (অর্থাৎ হরিয়া) বলিয়া থাকি; তাহারও উৎপত্তি এইরূপে। অর্থাৎ, রামক শ্যামক মধুক হরিক শব্দ ইহার মূল। সংস্কৃতে যে হ্রস্ব-অর্থে ক প্রত্যয় হয়, বাংলায় উক্ত দৃষ্টান্তগুলি তাহার নিদর্শন।

দুই-এক স্থলে মূল শব্দের ক প্রায় অবিকৃত আছে; যথা, হালকা, ইহা লঘুক শব্দজ। লহুক হইতে হলুক ও হলুক হইতে হালকা।

এই ক প্রত্যয় বিশেষণেই অধিক, এবং দুই-অক্ষরের ছোটো ছোটো কথাতেই ইহার প্রয়োগসম্ভাবনা বেশি। কারণ, বড়ো কথাকে ক সংযোগে বৃহত্তর করিলে তাহা ব্যবহারের পক্ষে কঠিন হয়। এইজন্যই বাংলা দুইঅক্ষরের বিশেষণ যাহা অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা অধিকাংশই আকারান্ত। যে-সকল বিশেষণ শব্দ দুইঅক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের

ঈষৎ ভিন্নরূপ বিকৃতি হইয়াছে; যথা, পাঠকক হইতে পড়ুয়া ও তাহা হইতে পোড়ো, পতিতক হইতে পড়ুয়া ও পোড়ো, মধ্যমক—মেঝুয়া মেঝো, উচ্ছিষ্টক—এঁঠুয়া এঁঠো, জলীয়ক—জলুয়া জোলো, কাষ্ঠিয়ক কাঠুয়া কেঠো ইত্যাদি। অনুরূপ দুই-একটি বিশেষ্য পদ যাহা মনে পড়িল তাহা লিখি। কিঞ্চিলিক শব্দ হইতে কেঁচুয়া ও কেঁচো হইয়াছে। স্বল্পাক্ষরক পেচক শব্দ হইতে পেঁচা ও বহ্বক্ষরক কিঞ্চিলিক হইতে কেঁচো শব্দের উৎপত্তি তুলনা করা যাইতে পারে। দীপরক্ষক শব্দ হইতে দের্খুতয়া ও দের্কখো আর-একটি দৃষ্টান্ত।

বাংলা-বিশেষণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

বীম্‌স্‌ সাহেব বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বলেন,চলিত কথায় আ স্বরের পর ঈ স্বর থাকিলে সাধারণত উভয়ে সংকুচিত হইয়া এ হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে দিয়াছেন, খাইতে—খেতে, পাইতে—পেতে। এইসঙ্গে বলিয়াছেন, in less common words অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এইরূপ সংকোচ ঘটে না; যথা, গাইতে হইতে গেতে হয় না।

গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত বলিয়া কেন গণ্য হইবে বুঝা যায় না। তাহার অপরাধের মধ্যে সে একটি নিয়মবিশেষের মধ্যে ধরা দেয় না। কিন্তু তাহার সমান অপরাধী আরো মিলিবে। বাংলায় এই-জাতীয় ক্রিয়াপদ যে-কয়টি আছে, সবগুলি একত্র করা যাক; খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে নাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে, এই তিনটি শব্দ বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়ম পালন করে, বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে।

এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা হ লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়; যথা, গাহিতে চাহিতে নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)।

হ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া করতে চলতে হয়; হইতে শব্দের ইকার লোপ হইয়া ‘হতে’ এবং লইতে শব্দের ইকার স্থানভ্রষ্ট হইয়া ‘নিতে’ হয়। কিন্তু, বহিতে সহিতে কহিতে শব্দের ইকার বইতে সইতে কইতে শব্দের মধ্যে টিঁকিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর-কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।

লইতে শব্দ লভিতে শব্দ হইতে উৎপন্ন; ভ হ-এ পরিণত হইয়া ‘লহিতে’ হয়। তদুৎপন্ন নিতে শব্দে ইকার যদিচ স্থানচ্যুত হইয়াছে তথাপি হ-এর জোরে টিকিয়া গেছে।

বীম্‌স্‌ তাঁহার উল্লিখিত নিয়মে একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার নিয়ম দুই-অক্ষরের কথায় খাটে না। হাতি শব্দে কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু হাতিয়ার শব্দের বিকারে হেতের হয়। আসি শব্দ ঠিক থাকে; ‘আসিয়া’ হয়—আস্যা, পরে হয়—এসে। খাই শব্দে পরিবর্তন হয় না; খাইয়া হয়—খায়্যা, পরে হয়—খেয়ে। এইরূপে হাঁড়িশাল হইতে হয়—হেঁসেল।

এ স্থলে এই নিয়মের চূড়ান্ত পর্যালোচনা হইল না; আমরা কেবল পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

‘এ’ স্বরবর্ণ কোথাও বা ইংরেজি came শব্দস্থিত a স্বরের মতো, কোথাও বা lack শব্দের a-র মতো উচ্চারিত হয়, বীম্‌স্‌ তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। ‘এ’ স্বরের উচ্চারণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমরা সাধনা পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। বীম্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, যাওয়া-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণ গ্যাল হইয়াছে, গিলিবার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণে বিশুদ্ধ একার রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন, অভ্যাস ব্যতীত ইহার নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে একটি সহজ নিয়ম আছে।

যে-সকল ক্রিয়াপদের আরম্ভ-শব্দে ইকার আছে, যথা, গিল মিল ইত্যাদি, তাহারা ইকারের পরিবর্তে একার গ্রহণ করিলে একারের উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে; যথা, গিলন হইতে গেলা, মিলন হইতে মেলা (মেলন শব্দ হইতে যে মেলা-র উৎপত্তি তাহার উচ্চারণ ম্যালা), লিখন হইতে লেখা, শিক্ষণ হইতে শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্বত্রই একারের উচ্চারণ অ্যা হইয়া যায়; যথা, খেলন—খেলা, ঠেলন—ঠেলা, দেখন—দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ গোড়ায় যেখানে ই থাকে সেটা হয় এ, গোড়ায় যেখানে এ থাকে সেটা হয় অ্যা। গোড়ায় কোথায় এ আছে এবং কোথায় ই আছে, তাহা ইতে প্রত্যয়ের দ্বারা ধরা পড়ে; যথা, গিলিতে মিলিতে লিখিতে শিখিতে মিটিতে পিটিতে; অন্যত্র, খেলিতে ঠেলিতে দেখিতে ঠেকিতে বেঁকিতে মেলিতে হেলিতে ইত্যাদি।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, ও এবং য় পরে পরে আসিলে তাহার উচ্চারণ প্রায় ইংরেজি w-র মতো হয়; যথা ওয়াশিল তল্‌ওয়ার ওয়ার্ড রেলওয়ে ইত্যাদি। একটা জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আছে, তাহা লক্ষ না করিয়া সাহেব একটি অদ্ভুত বানান করিয়াছেন; তিনি ইংরেজি will শব্দকে উয়িল অথবা উইল না লিখিয়া ওয়িল লিখিয়াছেন। ওয় সর্বত্রই ইংরেজি w-র পরিবর্তে

ব্যবহৃত হইতে পারে, কেবল এই 'ও' ইকারের পূর্বে উ না হইয়া যায় না। ব-এর সহিত যফলা যোগে দুই-তিন রকম উচ্চারণ হয় তাহা বীম্‌স্‌ সাহেব ধরিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তে অদ্ভুত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্যবহার-এর উচ্চারণ বেভার, ব্যক্তি-র উচ্চারণ বিক্তি, এবং ব্যতীত শব্দের উচ্চারণ বিতীত।

তাহা ছাড়া, কেবল ব-এর সঙ্গে যফলা যোগেই যে উচ্চারণবৈচিত্র্য ঘটে তাহা নহে সকল বর্ণ সম্বন্ধেই এইরূপ। ব্যবহার শব্দের ব্য এবং ত্যক্ত শব্দের ত্য উভয়েই যফলার স্থলে যফলা-আকার উচ্চারণ হয়। ইকারের পূর্বে যফলার উচ্চারণ এ হইয়া যায়, ব্যক্তি এবং ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত। নব্য ভব্য প্রভৃতি মধ্য বা শেষাক্ষরবর্তী যফলা আশ্রয়বর্ণকে দ্বিগুণিত করে মাত্র। ইকারের পূর্বে যফলা যেমন একার হইয়া যায়, তেমনই ক্ষ-ও একার গ্রহণ করে; যেমন ক্ষতি শব্দকে কথিত ভাষায় খেতি উচ্চারণ করে। ইহার প্রধান কারণ, ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণে আমরা সাধারণত যফলা যোগ করিয়া লই; এইজন্য ক্ষমা শব্দের ইতর উচ্চারণ খ্যামা।

আমরা বীম্‌স্‌ সাহেবের ব্যাকরণধৃত উচ্চারণ পর্যায় অনুসরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে দুই-চারিটা কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলার উচ্চারণতত্ত্ব ও বর্ণবিকারের নিয়ম বাঙালির দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই।

বাংলা বহুবচন

সংস্কৃত ভাষায় সাত বিভক্তি প্রাকৃতে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই বলিলেই হয় এবং ষষ্ঠীর দ্বারাই প্রথমা ব্যতীত অন্য সকল বিভক্তির কার্য সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষাগুলিতে প্রাকৃতের এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়।

সংস্কৃত ষষ্ঠীর স্য বিভক্তির স্থানে প্রাকৃতে শ্ শ হ হো হে হি বিভক্তি পাওয়া যায়। আধুনিক ভাষাগুলিতে এই বিভক্তির অনুসরণ করা যাক।

চহুবানহ পাস —চাঁদ : চহুবানের নিকট।
সংসারহি পারা —কবীর : সংসারের পার।
মুনিহিঁ দিখাঈ —তুলসীদাস : মুনিকে দেখাইলেন।
যুবরাজপদ রামহি দেহ —তুলসীদাস : যুবরাজপদ রামকে দেও।
কহ্যৌ সম খান্‌ততারহ —চাঁদ : তিনি খান্‌তাতারকে কহিলেন।
তত্তারহ উপরহ —চাঁদ : তাতারের উপরে।
আদিহিতে সব কথা সুনাঈ —তুলসীদাস : আদি হইতে তিনি সকল কথা শুনাইলেন।

উক্ত উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রায় সকল বিভক্তির কাজ সারিতেছে।

বাংলায় কী হয় দেখা যাক। বাংলায় যে-সকল বিভক্তিতে ‘এ’ যোগ হয় তাহার ইতিহাস প্রাকৃত হি-র মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত—গৃহস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত—ঘরহে, বাংলা—ঘরে। সংস্কৃত—তাম্রকস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত—তম্বঅহে, বাংলায়—তাঁবার (তাঁবাএ)।

পরবর্তী হি যে অপভ্রংশে একার হইয়া যায় বাংলায় তাহার অন্য প্রমাণ আছে। বারবার শব্দটিকে জোর দিবার সময় আমরা ‘বারে বারে’ বলি; সংস্কৃত নিশ্চয়ার্থসূচক হি-যোগে ইহা নিষ্পন্ন; বারহি বারহি—বারই বারই—বারে বারে। একেবারে শব্দটিরও ঐরূপ ব্যুৎপত্তি। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে ‘এ’ বিভক্তি যোগ ছিল, তাহা বাংলা কাব্যপ্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যায়:

লাজ কেন কর বধূজনে : কবিকঙ্কন।

করণ কারকেও ‘এ’ বিভক্তি চলে। যথা,

পূজিলেন ভূষণে চন্দনে।
ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ।
তিলকে ললাট শোভিত।

বাংলায় সম্প্রদান কর্মের অনুরূপ। যথা,

দীনে কর দান।
গুরুজনে করো নতি।

অধিকরণের তো কথাই নাই।

যাহা হউক, সম্বন্ধের চিহ্ন লইয়া প্রায় সকল কারকের কাজ চলিয়া গেল কিন্তু স্বয়ং সম্বন্ধের বেলা কিছু গোল দেখা যায়।

বাংলায় সম্বন্ধে ‘র’ আসিল কোথা হইতে। পাঠকগণ বাংলা প্রাচীনকাব্যে দেখিয়া থাকিবেন, তাহার যাহার প্রভৃতি শব্দের স্থলে তাকর যাকর প্রভৃতি প্রয়োগ কোথাও দেখা যায়। এই কর শব্দের ক লোপ পাইয়া র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়।

পশ্চিমি হিন্দির অধিকাংশ শাখায় ষষ্ঠীতে কো কা কে প্রভৃতি বিভক্তি যোগ হয়; যথা, ঘোড়েকা ঘোড়েকো ঘোড়েকৌ ঘোড়াকো।

বাংলার সহিত যাহাদের সাদৃশ্য আছে নিম্নে বিবৃত হইল; মৈথিলী—ঘোড়াকর ঘোড়াকের; মাগধী-ঘোড়াকের ঘোড়বাকর; মাড়োয়ারি—ঘোড়ারো; বাংলা—ঘোড়ার।

এই তালিকা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় কর শব্দ কোনো ভাষা সমগ্র রাখিয়াছে, এবং কোনো ভাষায় উহার ক অংশ এবং কোনো ভাষায় উহার র অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায়; যথা কস্‌স কেরকং এদং পবহণং—কাহার এই গাড়ি, তুহ্মহং কেরউং ধন—তোমার ধন, জসুকেরে হংকারউয়েঁ মুহহুঁ পড়ংতি তনাইঁ—যাহার হুংকারে মুখ হইতে তৃণ পড়িয়া যায়। ইহার সহিত চাঁদ কবির : ভীমহকরি সেন-ভীমের সৈন্য তুলসীদাসের : জীবহ্লকের কলেসা—জীবগণের ক্লেশ, তুলনা করিলে উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

এই কেরক শব্দের সংস্কৃত—কৃতক, কৃত। তস্যকৃত শব্দের অর্থ তাঁহার দ্বারা কৃত। এই কৃতবাচক সম্বন্ধ ক্রমে সর্বপ্রকার সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণেই প্রমাণ হইবে।

এই স্থলে বাংলা ষষ্ঠীর বহুবচন দের দিগের শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচ্য। এ স্থলে উদ্ধৃত করি :

বহুবচন বুঝাইতে পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু সব সকল প্রভৃতি সংযুক্ত হইত; যথা,

তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।—চৈ. ভা

ক্রমে আদি সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল; যথা, নরোত্তম বিলাসে,

শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
করিলেন নিযুক্ত শ্রীবাস আচার্যেরে॥
আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥

এইরূপে, রামাদি জীবাদি হইতে ষষ্ঠীর র সংযোগে—রামদের জীবদের হইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যায়।

আদি শব্দের উত্তরে স্বার্থে ক যুক্ত হইয়া বৃক্ষাদিক জীবাদিক শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ফলত উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায়; যথা, নরোত্তম বিলাসে,

“রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে॥
কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥”

এই ক-এর গ-এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ), জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর সংযোগে দিগের এবং কর্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত কে-র সংযোগে দিগকে পদ উৎপন্ন হইয়াছে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সম্পুর্ণ নিঃসংশয়ের কথা নহে। কারণ, দীনেশবাবু কেবল অকারান্ত পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইকার-উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ তিনি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এবং রামাদিগ হইতে রামদিগ হওয়া যত সহজ, কপ্যাদিগ হইতে কপিদিগ এবং ধেন্বাদিগ হইতে ধেনুদিগ হওয়া তত সহজ নহে।

হিন্দিভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সাধু হিন্দি—ঘোড়োঁকা, কনৌজি—ঘোড়নকো, ব্রজভাষা-ঘোড়োঁকৌ অথবা ঘোড়নিকৌ, মাড়োয়ারি—ঘোড়াঁরো, মেবারি—ঘোড়াঁকো, গঢবালি— ঘোড়াঁকো, অবধি-ঘোড়বনকর, রিবাই—ঘাঁড়নকর, ভোজপুরি—ঘোড়নকি, মাগধী—ঘোড়নকের, মৈথিলী—ঘোড়নিক ঘোড়নিকর।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, কা কো কের কর প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্নের বহুবচন নাই। বহুবচনের চিহ্ন মূল শব্দের সহিত সানুনাসিকরূপে যুক্ত।

অপভ্রংশ প্রাকৃতে ষষ্ঠীর বহুবচনে হং হুং হিং বিভক্তি হয়। সংস্কৃত নরাণাং কৃতকঃ শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে নরহং কেরও এবং হিন্দিতে নরোঁকো হয়। সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং হিন্দিতে বিচিত্র সানুনাসিকে পরিণত হইয়াছে।

বাংলায় এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের মতে সম্পূর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। নিম্নে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। হিন্দিতে কর্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষরূপে বহুবচন বুঝাইতে হইলে লোগ্‌গণ প্রভৃতি শব্দ অনুযোজন করা হয়।

প্রাচীন বাংলারও এই দশা ছিল, পুরাতন কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে; দেখা গিয়াছে, সব সকল প্রভৃতি শব্দের অনুযোজনাদ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু হিন্দিতে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন যোগের সময় শব্দের একবচন ও বহুবচন রূপ লক্ষিত হয়; যথা, ঘোড়েকো—একটি ঘোড়াকে, ঘোড়োঁকো—অনেক ঘোড়াকে। ঘোড়ে একবচনরূপ এবং ঘোঁড়ো বহুবচনরূপ।

পূর্বে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবিভক্তি চিহ্ন হে হি স্থলে বাংলায় একার দেখা যায়; যথা অপভ্রংশ প্রাকৃত—ঘরহে, বাংলার ঘরে।

হিন্দিতেও এইরূপ ঘটে। ঘোড়ে শব্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতের প্রথা অনুসারে প্রথমে গৌড়ীয় ভাষায় বিভক্তির মধ্যে ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্নই একমাত্র অবশিষ্ট ছিল; অবশেষে ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সেই ষষ্ঠীবিভক্তির সহিত সংলগ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকজ্ঞাপক শব্দযোজনা প্রবর্তিত হইল।

বাংলায় এই নিয়মের লক্ষণ একেবারে নাই তাহা নহে। ‘হাতর’ না বলিয়া বাংলায় হাতের বলে, ‘ভাইর’ না বলিয়া ভাইয়ের বলে, ‘মুখতে’ না বলিয়া মুখেতে এবং বিকল্প পাতে এবং পায়েতে বলা হইয়া থাকে।

প্রথমে, হাতে ভাইয়ে মুখে পায়ে রূপ করিয়া তাহাতে র তে প্রভৃতি বিশেষ বিভক্তি যোগ হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই একার প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবাচক হি হে-র অপভ্রংশ।

আমাদের বিশ্বাস বহুবচনেও বাংলা এক সময়ে হিন্দির অনুযায়ী ছিল এবং সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং বিভক্তি যেখানে হিন্দিতে সংক্ষিপ্ত সানুনাসিকে পরিবর্তিত হইয়াছে, বাংলায় তাহা দ আকার ধারণ করিয়াছে এবং কৃত শব্দের অপভ্রংশ কের তাহার সহিত বাহুল্য প্রয়োগরূপে যুক্ত হইয়াছে.।

তুলসীদাসে আছে, জীবহ্নকের কলেসা, এই জীবহ্নকের শব্দের রূপান্তর ‘জীবদিগের’ হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

ন হইতে দ হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন, বানর হইতে বান্দর ও বাঁদর।

কর্মকারকে জীবহ্নকে হইতে জীবদিগে শব্দের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের নূতন সৃষ্ট বাংলায় আমরা কর্মকারকে দিগকে লিখিয়া থাকি, কিন্তু কথিত ভাষায় মনোযোগ দিলে কর্মকারকে দিগে শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই শুনা যায়।

বোধ হয় সকলেই লক্ষ করিয়া থাকিবেন, সাধারণ লোকদের মধ্যে—আমাগের তোমাগের শব্দ প্রচলিত আছে। এরূপ প্রয়োগ বাংলার কোনো বিশেষ প্রদেশে বদ্ধ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে বারংবার শুনা গিয়াছে, ইহা নিশ্চয়। আমাগের তোমাগের শব্দের মধ্যস্থলে দ আসিবার প্রয়োজন হয় নাই; কারণ, ম সানুনাসিক বর্ণ হওয়াতে পার্শ্ববর্তী সানুনাসিককে সহজে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। যাগের তাগের শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই।

এই মতের বিরুদ্ধে সন্দেহের একটি কারণ বর্তমান আছে। আমরা সাধারণত, নিজদের লোকদের গাছদের না বলিয়া, নিজেদের লোকেদের গাছেদের বলিয়া থাকি। জীবহ্নকের—জীবহ্নর—জীবন্দের—জীবদের, এরূপ রূপান্তরপর্যায়ে উক্ত একারের স্থান কোথাও দেখি না।

মেওয়ারি কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির একটি প্রাচীন রূপ দেখা যায় হংদো। কাশ্মীরিতে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন হিংদ। জনহিংদ বলিতে লোকদিগের বুঝায়। বীম্‌স্‌ সাহেবের মতে এই হংদো ভূ ধাতুর ভবন্ত হইতে উৎপন্ন। যেমন কৃত একপ্রকারের সম্বন্ধ তেমনই ভূত আর-একপ্রকারের সম্বন্ধ।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, জনহিন্দকের জনহিঁন্দের শব্দের একপর্যায়গত শব্দ জনদিগের জনেদের, তাহা হইলে নিয়মে বাধে না। ঘরহিঁ স্থলে যদি ‘ঘরে’ হয় তবে জনহি স্থলে ‘জনে’

হওয়া অসংগত নহে। বাংলার প্রতিবেশী আসামি ভাষায় হঁত শব্দ বহুবচনবাচক। মানুহহঁত অর্থে মানুষগণ বুঝায়। হঁত এবং হংদ শব্দের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হংদ সম্বন্ধবাচক বহুবচন, হঁত বহুবচন কিন্তু সম্বন্ধবাচক নহে।

পরন্তু সম্বন্ধ ও বহুবচনের মধ্যে নৈকট্য আছে। একের সহিত সম্বন্ধীয়গণই বহু। বাংলায় রামের শব্দ সম্বন্ধসূচক, রামেরা বহুবচনসূচক; রামেরা বলিতে রামের গণ, অর্থাৎ রাম-সম্বন্ধীয়গণ বুঝায়। নরা গজা প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন বাংলায় বহুবচনে আকার প্রয়োগ দেখা যায়, রামের শব্দকে সেইরূপ আকারযোগে বহুবচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

নেপালি ভাষায় ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে স্থলে দেবেরা বলি তাহারা দেবহেরু বলে। হে এবং রু উভয় শব্দই সম্বন্ধবাচক এবং সম্বন্ধের বিভক্তি দিয়াই বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আসামি ভাষায় ইঁহতর শব্দের অর্থ ইঁহাদের, তঁহতর তোমাদের। ইহঁত-কের ইঁহাদিগের, তঁহত-কের তোমাদিগের, কানে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। কর্মকারকেও আসামি ইহতঁক বাংলা ইহাঁদিগের সহিত সাদৃশ্যবান।

এই হঁত শব্দ রাজপুত হংদো শব্দের ন্যায় ভবন্ত বা সন্ত শব্দানুসারী, তাহা মনে করিবার একটা কারণ আছে। আসামিতে হঁওতা শব্দের অর্থ হওয়া।

এ স্থলে এ কথাও স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, পশ্চিমি হিন্দির মধ্যে রাজপুত ভাষাতেই সাধারণপ্রচলিত সম্বন্ধকারক বাংলার অনুরূপ; গোড়ার শব্দের মাড়োয়ারি ও মেবারি ঘোড়ারো, বহুবচনে ঘোড়ারোঁ।

পাঞ্জাবি ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন দা, স্ত্রীলিঙ্গে দী। ঘোড়াদা—ঘোড়ার, যন্ত্রদীবাণী—যন্ত্রের বাণী। প্রাচীন পাঞ্জাবিতে ছিল ডা। আমাদের দিগের শব্দের দ-কে এই পাঞ্জাবি দ-এর সহিত এক করিয়া দেখা যাইতে পারে। ঘোড়াদা-কের—ঘোড়াদিগের।

বীম্‌স্‌ সাহেবের মতে পাঞ্জাবি এই দা শব্দ সংস্কৃত তন শব্দের অপভ্রংশ। তন শব্দের যোগে সংস্কৃত পুরাতন সনাতন প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি। প্রাকৃতেও ষষ্ঠীবিভক্তির পরে কের এবং তণ উভয়ের ব্যবহার আছে; হেমচন্দ্রে আছে, সম্বন্ধিনঃ কেরতণৌ। মেবারি তণো তণুঁ এবং বহুবচনে তণাঁ ব্যবহার হইয়া থাকে। তণাঁ-র উত্তর কের শব্দ যোগ করিলে 'তণাকের' রূপে

দিগের শব্দের মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যে অধিকাংশ স্থলে সব শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

এখনো বাংলায় সব শব্দের যোগ চলিত আছে। কাব্যে তাহার দৃষ্টান্ত :

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল।

কিন্তু কথিত ভাষায় উক্তপ্রকার কাব্যপ্রয়োগের সহিত নিয়মের প্রভেদ দেখা যায়। কাব্যে আমাসব, তোমাসব, পাখিসব প্রভৃতি কথায় দেখা যাইতেছে সব শব্দই বহুবচনের একমাত্র চিহ্ন, কিন্তু কথিত ভাষায় অন্য বহুবচনবিভক্তির পরে উহা বাহুল্য রূপে ব্যবহৃত হয়—আমরা সব, তোমরা সব, পাখিরা সব; যেন, আমরা তোমরা পাখিরা ‘সব’ শব্দের বিশেষণ।

ইহা হইতে আমাদের পূর্বের কথা প্রমাণ হয়, রা বিভক্তি বহুবচনবাচক বটে কিন্তু উহা মূলে সম্বন্ধবাচক। ‘পাখিরা সব’ অর্থ পাখিসম্বন্ধীয় সমষ্টি।

ইহা হইতে আর-একটা দেখা যায়, বিভক্তির বাহুল্যপ্রয়োগ আমাদের ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। লোকেদের শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, প্রথমত লোকে শব্দের এ প্রাচীন ষষ্ঠীবাচক, তাহার পর দা শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ষষ্ঠীবিভক্তি, তাহার পর কের শব্দ সম্বন্ধবাচক বাহুল্যপ্রয়োগ।

মৈথিলীভাষায় সব শব্দ যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের প্রাচীন কাব্যের ন্যায়। নেনাসভ অর্থে বালকেরা সব, নেনিসভ—বালিকারা সব; কিন্তু এ সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না। কারণ, মৈথিলীতে অন্য কোনোপ্রকার বহুবচনবাচক বিভক্তি নাই। বাংলায় রা বিভক্তিযোগে বহুবচন সমস্ত গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, কেবল নেপালি হেরু বিভক্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু রা বিভক্তিযোগে বহুবচব কেবল সচেতন পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। আমরা বাংলায় ফলেরা পাতারা বলি না। এই কারণেই ফলেরা সব, পাতারা সব, এমন প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

মৈথিলী ভাষায় ফলসভ, কথাসভ, এরূপ ব্যবহারের বাধা নাই। বাংলায় আমরা এরূপ স্থলে ফলগুলা সব, পাতাগুলা সব, বলিয়া থাকি।

সচেতন পদার্থ বুঝাইতে লোকগুলা সব, বানরগুলা সব বলিতেও দোষ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে গুলা যোগে বাংলায় সচেতন অচেতন সর্বপ্রকার বহুবচনই সিদ্ধ হয়। এক্ষণে এই গুলা শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নেপালি বহুবচনভিত্তিক হেরু শব্দের উৎপত্তি প্রাকৃতভাষায় কেরউ হইতে। অস্মহং কেরউ— আমাদিগের। কেরউ—কেরু—হেরু।

বাংলা রা যেমন সম্বন্ধবাচক হইতে বহুবচনবাচকে পরিণত হইয়াছে, নেপালি হেরু শব্দেরও সেই গতি।

নেপালিতে কেরু শব্দের কে হে হইয়াছে, বাংলায় তাহা গে হইয়াছে, দিগের শব্দে তাহার প্রমাণ আছে।

কেরু হইতে গেরু, গেরু হইতে গেলু, গেলু হইতে গুলু, গুলু হইতে গুলো ও গুলা হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ স্বরবর্ণবিপর্যয়ের উদাহরণ অনেক আছে; বিন্দু হইতে বুঁদ তাহার একটি, মুদ্রিকা হইতে মাদুলি অন্যপ্রকারের (এই বুঁদ শব্দ হইতে বিন্দু-আকার মিষ্টান্ন বোঁদে শব্দের উদ্ভব)।

ঘোড়াকেরু নেপালিতে হইল ঘোড়াহেরু, বাংলায় হইল ঘোড়াগুলো।

গুলি ও গুলিন্ শব্দ গুলা-র স্ত্রীলিঙ্গ। ক্ষুদ্র জিনিস বুঝাইতে এক সময়ে বঙ্গভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার হইত তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে; যথা বড়া বড়ি, গোলা গুলি, খোঁটা খুঁটি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, ছোরা ছুরি, জাঁতা জাঁতি, আংটা আংটি, শিকল শিক্‌লি ইত্যাদি।

প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়, সব অপেক্ষা গণ শব্দের প্রচলন অনেক বেশি। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কনচণ্ডী দেখিলে তাহার প্রমাণ হইবে; অন্য বাংলা প্রাচীন কাব্য এক্ষণে লেখকের হস্তে বর্তমান নাই, এইজন্য তুলনা করিবার সুযোগ হইল না।

এই গণ শব্দ হইতে গুলা হওয়াও অসম্ভব নহে। কারণ, গণ শব্দের অপভ্রংশ প্রাকৃত গণু। জানি না ধ্বনিবিকারের নিয়মে গণু হইতে গলু ও গুলো হওয়া সুসাধ্য কি না।

কিন্তু কেরু হইতেই যে গুলো হইয়াছে লেখকের বিশ্বাসের ঝোঁকটা সেই দিকে। তাহার কারণ আছে; প্রথমত রা বিভক্তির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত নেপালি হেরু শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তৃতীয়ত যাহার যুক্তিপরম্পরা অপেক্ষাকৃত দুরূহ এবং যাহা প্রথম শ্রুতিমাত্রেই প্রত্যয় আকর্ষণ করে না উদ্ভাবকের কল্পনা তাহার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়।

এইখানে বলা আবশ্যক, উড়িয়া ও আসামির সহিত যদিচ বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আছে তথাপি বহুবচন সম্বন্ধে বাংলার সহিত তাহার মিল পাওয়া যায় না।

উড়িয়া ভাষায় মানে শব্দযোগে বহুবচন হয়। ঘর একবচন, ঘরমানে বহুবচন। বীম্‌স্‌ বলেন, এই মানে শব্দ পরিমাণ হইতে উদ্ভূত; হ্যর্ন্‌লে বলেন, মানব হইতে। প্রাচ্য হিন্দিতে মনুষ্যগণকে মনই বলে, মানে শব্দ তাহারই অনুরূপ।

হিন্দিতে কর্তৃকারক বহুবচন লোগ্‌ (লোক) শব্দযোগে সিদ্ধ হয়; ঘোড়ালোগ—ঘোড়াসকল। বাংলাতেও শ্রেণীবাচক বহুবচনে লোক শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা, পণ্ডিতলোক মূর্খলোক গরিবলোক ইত্যাদি।

আসামি ভাষার বিলাক হঁত এবং বোর শব্দযোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে হঁত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিলাক এবং বোর শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় সুকঠিন।

যাহাই হউক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধের বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি এবং নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার এই-সকল বহুবচন রূপের যোগ পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

সম্বন্ধের একবচনেও অপর গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার প্রভেদ আছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কেবল মাড়োয়ারি ও মেবারি রো বিভক্তি বাংলার র বিভক্তির সহিত সাদৃশ্যবান। এ কথাও বলা আবশ্যক উড়িয়া ও আসামি ভাষার সহিতও এ সম্বন্ধে বাংলার প্রভেদ নাই। অপরাপর গৌড়ীয় ভাষায় কা প্রভৃতি যোগে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়।

কিন্তু একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ করিবার আছে।

উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী একবচনে কী বহুবচনে প্রায় কোথাও ষষ্ঠীতে ককারের প্রয়োগ নাই, প্রায় সর্বত্রই রকার ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা, সাধুহিন্দি—একবচনে মেরা, বহুবচনে হমারা। কনৌজি—মেরো, হমারো। ব্রজভাষা—মেরৌ, হমারৌ। মাড়োয়ারি—মারো, ম্হারো। মেৱারি—ম্হারো, হ্মাঁৱরাঁরো। অৱধি—মোর, হমার। রিৱাই—ম্‌ৱার, হম্‌হার।

মধ্যমপুরুষেও—তেরা তুম্‌হরা তোর তুমার, ত্‌ৱার তুম্‌হার প্রভৃতি প্রচলিত।

কোনো কোনো ভাষায় বহুবচনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায়; যথা নেপালি—হামে ৱুকো, ভোজপুরি-হেমরণকে, মাগধী—হমরণীকে, মৈথিলী—হমরাসভকে।

অন্য গৌড়ীয় ভাষায় কেবল সর্বনামের ষষ্ঠী বিভক্তিতে যে রকার বর্তমান, বাংলায় তাহা সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই বর্তমান।

ইহা হইতে অনুমান করি, ককার অপেক্ষা রকার ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাচীনতর রূপ।

এখানে আর-একটি লক্ষ করিবার বিষয় আছে। একবচনে যেখানে তেরা বহুবচনে সেখানে তুম্‌হরা, একবচনে ম্‌বার বহুবচনে হম্‌হার। নেপালিভাষায় কর্তৃকারক বহুবচনে হেরু বিভক্তি পাওয়া যায়; এই হেরু হার এবং হরা সাদৃশ্যবান।

কিন্তু নেপালিতে হেরু নাকি কর্তৃকারক বহুবচনে ব্যবহার হয়, এইজন্য সম্বন্ধে রকারের পরে পুনশ্চ রকার-যাগ সম্ভব হয় নাই, কো শব্দযোগে ষষ্ঠী করিতে হইয়াছে। অথচ নেপালি একবচনে মেরো হইয়া থাকে।

মৈথিলী ষষ্ঠীর বহুবচনে হমরাসভকে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

পূর্বে বলিয়াছি বাংলায় কর্তৃকারক বহুবচনে সব শব্দের পূর্বে বহুবচনবাচক রা বিভক্তি বসে, যথা ছেলেরা সব; কিন্তু মৈথিলীতে শুদ্ধ নেনাসভ বলিতেই বালকেরা সব বুঝায়। পূর্বে এ কথাও বলিয়াছি এ সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না, কারণ, মৈথিলীতে বাংলার ন্যায় কর্তৃকারক বহুবচনের কোনো বিশেষ বিভক্তি নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে সর্বনাম উত্তম ও মধ্যম পুরুষে মৈথিলী কর্তৃকারক বহুবচনে হমরাসভ তোহরাসভ ব্যবহার হয়, এবং অন্যান্য কারকেও হমরাসভকে তোহরাসভকে প্রভৃতি প্রচলিত।

মৈথিলী সর্বনামশব্দে যে ব্যবহার, বাংলায় সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই সেই ব্যবহার।

ইহা হইতে দুই প্রকার অনুমান সংগত হয়। হয়, এই হমরা এককালে বাংলা ও মৈথিলী উভয় ভাষায় বহুবচনরূপ ছিল, নয় এককালে যাহা কেবল সম্বন্ধের বিভক্তি ছিল বাংলায় তাহা ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া কর্তৃকারক বহুবচন ও মৈথিলী ভাষায় তাহা কেবল সর্বনাম শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তিতে দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য আমাদের এই আলোচনাগুলি সংশয়পরিশূন্য নহে। পাঠকগণ ইহাকে অনুসন্ধানের সোপানস্বরূপে গণ্য করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্ন্‌লে-সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্‌-সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন-সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

সম্বন্ধে কার

সংস্কৃত কৃত এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ কের শব্দ হইতে বাংলাভাষায় সম্বন্ধে র বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্বে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে—তাহার যাহার অর্থে তাকর যাকর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বর্তমানে অপ্রচলিত পুরাতন দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এখনো সম্বন্ধে বাংলায় কার শব্দপ্রয়োগ ব্যবহৃত হয়; যথা, এখনকার তখনকার ইত্যাদি।

কিন্তু এই কার শব্দের প্রয়োগ কেবল স্থলবিশেষেই বদ্ধ। কৃত শব্দের অপভ্রংশ কার কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবলমাত্র তাহার র অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে, তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।

উচ্চারণের বিশেষ নিয়মঘটিত কারণে অনেক সময়ে বিভক্তির পরিবর্তন হইয়া থাকে; যথা, অধিকরণে মাটির বেলায় আমরা বলি মাটিতে, ঘোড়ার বেলায় বলি ঘোড়ায়। কিন্তু এ স্থলে সে কথা খাটে না। লিখন শব্দের বেলায় আমরা সম্বন্ধে বলি—লিখনের, কিন্তু এখন শব্দের বেলায় এখনের বলি না, বলি—এখনকার। অথচ লিখন এবং এখন শব্দে উচ্চারণনিয়মের কোনো প্রভেদ হইবার কথা নাই।

বাংলায় কোন্ কোন্ স্থলে সম্বন্ধে কার শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইল।

এখনকার তখনকার যখনকার কখনকার।
এখানকার সেখানকার যেখানকার কোন্খানকার।
এ-বেলাকার ও-বেলাকার সে-বেলাকার।
এ-সময়কার ও-সময়কার সে-সময়কার।
সে-বছরকার ও-বছরকার এ-বছরকার।
যে-দিনকার সে-দিনকার ও-দিনকার এ-দিনকার।

এ-দিককার ও-দিককার সে-দিককার—দক্ষিণ দিককার, উত্তর দিককার, সম্মুখ দিককার, পশ্চাৎ দিককার।

আজকেকার কালকেকার পরশুকার।

এপারকার ওপারকার উপরকার নীচেকার তলাকার কোথাকার।
দিনকার রাত্রিকার।
এ-ধারকার ও-ধারকার সামনেকার পিছনকার।
এ-হপ্তাকার ও-হপ্তাকার।
আগেকার পরেকার কবেকার।
একালকার সেকালকার।
প্রথমকার শেষেকার মাঝেকার।
ভিতরকার বাহিরকার।
আগাকার গোড়াকার।
সকালকার বিকালকার।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় সময় এবং অবস্থান (position) -সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত কার বিভক্তির যোগ।

কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে, তাহারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আমরা বলি—দিনের বেলা, দিনকার বেলা বলি না। অথচ সেদিনকার শব্দ প্রচলিত আছে। সময় শব্দের সম্বন্ধে সময়ের বলি, অথচ তৎপূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম যোগ করিলে সম্বন্ধে কার বিভক্তি বিকল্পে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রমাণ হয়, সময় ও দেশ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ সীমা নির্দিষ্ট হয়, সেইখানেই কার শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। সেদিনের কথা এবং সেদিনকার কথা—এ দুটা শব্দের একটি সূক্ষ্ম অর্থভেদ আছে। সেদিনের অর্থ অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, সেদিনের কথা বলিতে অতীতকালের অনেক দিনের কথা বুঝাইতে পারে, কিন্তু সেদিনকার কথা বলিতে বিশেষ একটি দিনের কথা বুঝায়। যেখানে সেই বিশেষত্বের উপর বেশি জোর দিবার প্রয়োজন, কোনোমতে দেশ বা কালের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার জো নাই, সেখানে শুদ্ধমাত্র এর বিভক্তি না দিয়া কার বিভক্তি হয়।

অতএব বিশেষার্থবোধক, সময় এবং অবস্থাসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তরে সম্বন্ধে কার প্রত্যয় হয়।

ইহার দুটি অথবা তিনটি ব্যতিক্রম চোখে পড়িতেছে। একজনকার দুইজনকার ইত্যাদি, ইহা মনুষ্যসংখ্যাবাচক, দেশকালবাচক নহে। মনুষ্যসমষ্টিবাচক—সকলকার। এবং সত্যকার।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলকার হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না (প্রাচীন বাংলায় সভাকার), সত্যকার হয় কিন্তু মিথ্যাকার হয় না। এবং মনুষ্য সংখ্যাবাচক একজন দুইজন ব্যতীত পশু বা জড়সংখ্যাবাচক একটা দুইটা-র সহিত কার শব্দের সম্পর্ক নাই।

অবস্থানবাচক যে-সকল শব্দে কার প্রত্যয় হয় তাহার অধিকাংশই বিশেষণ; যথা, উপর নীচ সমুখ পিছন আগা গোড়া মধ্য ধার তল দক্ষিণ উত্তর ভিতর বাহির ইত্যাদি। বিশেষ্যের মধ্যে কেবল খান (স্থান) পার ও ধার শব্দ। এই তিনটি বিশেষ্যের বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহাদের পূর্বে এ সে প্রভৃতি বিশেষার্থবোধক সর্বনাম-বিশেষণ যুক্ত না হইলে ইহাদের উত্তরে কার প্রত্যয় হয় না; যথা সেখানকার এপারকার ওধারকার। কিন্তু, ভিতরকার বাহিরকার প্রভৃতি শব্দে সে কথা খাটে না।

সময়বাচক যে-সকল শব্দের উত্তর কার প্রত্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই বিশেষ্য; যথা, দিন রাত্রি ক্ষণ বেলা বার বছর হপ্তা ইত্যাদি। এইরূপ সময়বাচক বিশেষ্য শব্দের পূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম-বিশেষণ না থাকিলে তদুত্তরে কার প্রয়োগ হয় না। শুদ্ধমাত্র—বারকার বেলাকার ক্ষণকার হয় না, এবেলাকার এখানকার এক্ষণকার এবারকার হয়। বিশেষণ শব্দে অন্যরূপ।

সময়বাচক বিশেষ্য শব্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাস মুহূর্ত দণ্ড ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের সহিত কার শব্দের যোগ হয় না। ইহার কারণ নির্ধারণ সুকঠিন।

যাহা হউক দেশ সম্বন্ধে একটা মোটা নিয়ম পাওয়া যায়। দেশবাচক যে-সকল শব্দে সংস্কৃতে বর্তী শব্দ হইতে পারে, বাংলায় তাহার স্থানে কার ব্যবহার হয়। ঊর্দ্ধবর্তী নিম্নবর্তী সম্মুখবর্তী পশ্চাদ্বর্তী অগ্রবর্তী প্রভৃতি শব্দের স্থলে বাংলায় উপরকার নীচেকার সামনেকার পিছনকার আগাকার ইত্যাদি প্রচলিত। ঋজুবর্তী বক্রবর্তী লম্ববর্তী ইত্যাদি কথা সংস্কৃতে নাই, বাংলাতেও সোজাকার বাঁকাকার লম্বাকার হইতে পারে না।

বাংলা শব্দদ্বৈত

ব্রুগ্‌মান তাঁহার ইন্ডোজর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন, একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা, পুনর্বৃত্তি (repetition), দীর্ঘকাল বর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইন্ডোজর্মানীয় ভাষার অভিব্যক্তিদশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্ডোজর্মান ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া গেছে; সংস্কৃত ভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত, মর্মর গর্গর, (ঘড়া, জলশব্দের অনুকরণে), গদ্‌গদ বর্বর (অস্পষ্টভাষী) কঙ্কণ। দ্বিগণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে; যথা, কর্কশ কঙ্কর ঝঞ্ঝা বম্ভর (ভ্রমর) চঞ্চল।

অসংযুক্ত ভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে, যথা, কালে কালে, জন্মজন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, পীত্বা পীত্বা, যথা যথা, যদ্‌যৎ, অহরহঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ, সুখসুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্যভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়—এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে—এগুলি পরস্পর-সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে—এগুলি নিয়তবর্তিকা বাচক, অর্থাৎ এগুলিতে সর্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া—এগুলি দীর্ঘকালীনতাবাচক।

অন্য অন্য, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুকরা টুকরা—এগুলি বিভক্ত বহুলতাবাচক। নূতন নূতন কাপড়, বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করিয়া দেখা হয়। অনেক অনেক লোক, বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ ‘অনেক লোক’ বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, রকম রকম—এগুলিও পূর্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল, বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বোঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা—এগুলিও পূর্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে—এ দুইটিও ঐ প্রকার। আশায় আশায় আছি, অর্থাৎ প্রত্যেকবার আশা হইতেছে; ভয়ে ভয়ে আছি, অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক পৃথক রূপে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি, বস্তা বস্তা—এগুলিও পূর্বানুরূপ।

টাটকা টাটকা, গরম গরম, ঠিক ঠিক—এগুলি প্রকর্ষবাচক।

টাটকা টাটকা বলিলে টাটকা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার চার, তিন তিন—এগুলিও পূর্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।

গলায় গলায় (আহার) কানে কানে (কথা)—ইহাও পূর্বশ্রেণীর; অর্থাৎ অত্যন্তই গলা পর্যন্ত পূর্ণ, নিতান্তই কানের নিকটে গিয়া কথা। হাতে হাতে (ফল, বা ধরা পড়া), বোধ করি স্বতন্ত্রজাতীয়। বোধ করি তাহার অর্থ এই যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা অমনি সেই হাতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, যে-হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপনি আপনি, তখনই তখনই—পূর্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষরূপে নিজেই, আপনিই আর কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। সকাল সকাল শব্দও বোধ করি এই-জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতরূপে সকাল।

জ্বল্ জ্বল্, চুর্ চুর্, ঘুর্ ঘুর্, টল্ টল্, নড়্ নড়্—এগুলি জ্বলন চূর্ণন ঘূর্ণন টলন নর্তন শব্দজাত; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাংলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে; যথা, যাব যাব, উঠি উঠি; মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, মর্ মর্, পড়ো পড়ো, ভরা ভরা, ফাঁকা ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদো কাঁদো, হাসি হাসি।

মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন, অর্থে—মান প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা) এই-জাতীয়; অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারই নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্যভাষায় দেখা যায় না। ফরাসি ভাষায় একপ্রকার শব্দব্যবহার আছে যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসি চলিত ভাষায় কোনো জিনিসকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যথা, me-mere মে-মেয়ার্, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার্ অর্থে মা, মেমেয়ার্ অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। bete বেট্ শব্দের অর্থ জন্তু, be-bete বে বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট পশু, আদরের পশুটি; অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্বতা বুঝাইতেছে।

আর-একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্যভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক; যেমন, জল-টল পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরো যে ক'টা আনুষঙ্গিক জিনিস শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচকা-বুঁচকি দড়া-দড়ি গোলা-গুলি কাটি-কুটি গুঁড়া-গাঁড়া কাপড়-চোপড়—এগুলিও প্রভৃতিবাচক বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দিষ্টতর। বোঁচকা-বুঁচকি বলিলে ছোটো বড়ো মাঝারি একজাতীয় নানাপ্রকার বোঁচকা বোঝায়, অন্য জাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রি হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষাবিৎ পন্ডিতগণ বাংলাভাষার সহিত তৎতৎ ভাষার শব্দদ্বৈতবিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না।

আইঢাই আঁকুবাঁকু আনচান আমতা-আমতা।

ইলিবিলি।

উসখুস।

কচ কচাৎ কচকচ কচাকচ কচর-কচর কচমচ কচর-মচর কট কটাৎ কটাস কটকট কটাকট কটমট কটরমেটর কড়কড় কড়াৎ কড়মড় কড়র-মড়র কনকন কপ কপাৎ কপকপ কপাকপ করকর কলকল কসকস কিচকিচ কিচমিচ কিচির মিচির কিটকিট কিড়মিড় কিরকির কিলকিল কিলবিল কুচ কুচকুচ কুট কুটকুট কুটুর-কুটুর কুটুস কুপ কুপকুপ কুপকাপ কুলকুল কুরকুর কুঁইকুঁই কেঁইমেই কেঁউমেউ ক্যাঁ ক্যাঁক্যাঁ কোঁকোঁ কোঁৎকোঁৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচক্যাঁচ ক্যাঁচর-ক্যাঁচর ক্যাঁটক্যাঁট। কচকচে কটমটে কড়কড়ে কনকনে করকরে কিটকিটে (তেল কিটকিটে) কিরকিরে কিলবিলে কুচকুচে কুটকুটে ক্যাঁটকেঁটে॥

খক খকখক খচখচ খচাখচ খচমচ খট খটখট খটাখট খটাস খটাৎ খটর খটর খটমট খটরমটর খড়খড় খড়মড় খন খনখন খপ খপাৎ খপাস খরখর খলখল খসখস খাঁ-খাঁ খিক খিকখিক খিটখিট খিটমিট খিটিমিটি খিলখিল খিসখিস খুক খুকখুক খুটখুট খুটুর-খুটুর খুটুস-খুটুস খুটখাট খুঁৎখুঁৎ খুঁৎমুৎ খুরখুর খুসখুস খেঁইখেঁই খ্যাঁক খ্যাঁকখ্যাঁক খ্যাঁচখ্যাঁচ খ্যাঁচাখেঁচি খ্যাঁৎখ্যাঁৎ খ্যানখ্যান। খটখটে খড়খড়ে খরখরে খসখসে খিটমিটে খিটখিটে খুঁৎখুঁতে খুঁৎমুতে খুসখুসে (কাশি) খ্যানখেনে॥

গজগজ গজর-গজর গট গটগট গড়গড় গদগদ গনগন গপগপ গবগব গবাগব গমগম গরগর গলগল গসগস গাঁগাঁ গাঁইগুঁই গাঁকগাঁক গিজগিজ গিসপিস গুটগুট গুড়গুড় গুনগুন গুপগুপ গুবগাব গুম গুমগুম গুরগুর গেঁইগেঁই গোঁগোঁ গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন) গমগমে গুড়গুড়ে॥

ঘটঘট ঘটর-ঘটর ঘড়ঘড় ঘসঘস ঘিনঘিন ঘিসঘিস ঘুটঘুট ঘুটমুট ঘুরঘুর ঘুসঘুস ঘেউঘেউ ঘোঁৎঘোঁৎ ঘেঁচ ঘেঁচঘেঁচ ঘ্যাঁচর-ঘ্যাঁচর ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানর-ঘ্যানর। ঘুরঘুরে ঘুসঘুসে (জ্বর) ঘ্যানঘেনে॥

চকচক চকর-চকর (পশুর জলপান-শব্দ) চকমক চট চটাস চটচট চটাচট চটপট চটাপট চচ্চড় চড়াৎ চড়াস চড়াচ্চড় চন চনচন চপচপ চপাচপ চিঁচিঁ চিকচিক চিকমিক চিটচিট চিচ্চিড় চিড়িক চিড়িক-চিড়িক চিড়বিড় চিন চিনচিন চুকচুক চুকুর-চুকুর চুচ্চুর চেঁইভেঁই চেঁইমেই চোঁ চোঁচোঁ চোঁভোঁ চোঁচাঁ চ্যাঁচ্যাঁ চ্যাঁভ্যাঁ। চকচকে চটচটে চটপটে চনচনে চিকচিকে চিটচিটে চিনচিনে চুকচুকে চুচ্চুরে॥

ছটফট ছপছপ ছপাছপ ছপাৎ ছপাস ছমছম ছলছল ছোঁ ছোঁছোঁ ছ্যাঁক ছ্যাঁকছ্যাঁক। ছটফটে ছলছলে ছলোছলো ছ্যাঁকছেঁকে ছিপছিপে॥

জরজর জ্যাবজ্যাব জ্যালজ্যাল। জবজবে জিরজিরে জ্যালজেলে জিলজিলে॥

ঝকঝক ঝকমক ঝটপট ঝড়াৎ ঝন ঝনঝন ঝপ ঝপঝপ ঝপাঝপ ঝমঝম ঝমাৎ ঝমাস ঝমর-ঝমর ঝমাজ্ঝম ঝরঝর ঝাঁ-ঝাঁ ঝিকঝিক ঝিকমিক ঝিকিমিকি ঝিনঝিন ঝিরঝির ঝুনঝুন ঝুপঝুপ ঝুমঝুম। ঝকঝকে ঝরঝরে ঝিকঝিকে॥

টক টকটক টকাটক টংটং টন টনটন টপ টপটপ টপাটপ টলটল টলমল টসটস টিকটিক টিকিস-টিকিস টিংটিং টিপটিপ টিমটিম টুকটুক টুকুস-টুকুস টুংটুং টুংটাং টুনটুন টুপ টুপটুপ টুপুস-টুপুস টুপটাপ টুসটুস টোটো ট্যাট্যাঁ ট্যাঁসট্যাঁস ট্যাঁঙস-ট্যাঁঙস। টকটকে টনটনে টলটলে টসটসে টিংটিঙে টিপটিপে টিমটিমে টুকটুকে টুপটুপে টুসটুসে ট্যাসটেসে॥

ঠক ঠকঠক ঠকর-ঠকর ঠংঠং ঠনঠন ঠুক ঠুকঠুক ঠুকুর-ঠুকুর ঠকাঠক ঠকাৎ ঠকাস ঠুকুস-ঠুকুস ঠুকঠাক ঠংঠুং ঠুনঠুন ঠ্যাংঠ্যাং ঠ্যাসঠ্যাস। ঠনঠনে ঠ্যাংঠেঙে॥

ডগডগে (লাল) ডিগডিগে॥

ঢক ঢকঢক ঢকাঢক ঢকাস ঢকাৎ ঢবঢব ঢলঢল ঢুকঢুক ঢুলঢুল ঢ্যাবঢ্যাব। ঢকঢকে ঢলঢলে ঢুলঢুলে ঢুলুঢুলু ঢ্যাবঢেবে॥

তকতক তড়তড় তড়াত্তড় তড়াক-তড়াক তরতর তলতল তুলতুল তিড়িং তিড়িং-তিড়িং তড়াং তড়াংতেড়াং। তকতকে তলতলে তুলতুলে॥

থকথক থপ থপাৎ থপাস থপথপ থমথম থরথর থলথল থসথস থৈ-থৈ; থকথকে থপথপে থমথমে থলথলে থসথসে থুড়থুড়ে থ্যাসথেসে॥

দগদগ দপদপ দবদব দমদম দমাদ্দম দরদর দড়াদ্দড় দড়াম দাউদাউ দুদ্দুড় দুদ্দাড় দুপদুপ দুপদাপ দুমদুম দুমদাম। দগদগে (রক্তবর্ণ বা অগ্নি)॥

ধক্ ধকধক ধড়ধড় ধড়াস ধড়াস-ধড়াস ধড়াদ্ধড়, ধড়ফড় ধড়মড় ধপ ধপধপ ধপাধপ ধমাস ধবধব ধম ধমধম ধমাদ্ধম ধস ধসধস ধাঁ ধাঁ-ধাঁ ধিকি ধিকিধিকি ধিনধিন ধুকধুক ধুম ধুমধুম ধুমধাম ধুমাধুম ধুপধাপ ধূ-ধূ ধেইধেই। ধড়ফড়ে ধপধপে ধবধবে ধসধসে॥

নড়নড় নড়বড় নড়র-বড়র নিশপিশ নিড়বিড়। নন্নড়ে নড়বড়ে নিশপিশে নিড়বিড়ে॥

পট পটপট পটাপট পটাৎ পটাস পটাস-পটাস পচপচ পড়পড় (ছেঁড়া) প্‌ড়াস প্‌ড়াৎ পড়াং প্‌ড়াংপ্‌ড়াং প্‌ড়িংপ্‌ড়িং পিটপিট পিলপিল পিঁপিঁ পুট পুটপুট পোঁপোঁ প্যাঁকপ্যাঁক প্যাঁচপ্যাঁচ প্যানপ্যান প্যাঁটপ্যাঁট পটাং পটাংপটাং। পিটপিটে পুসপুসে প্যাঁচপেঁচে প্যানপেনে॥

ফটফট ফটাফট ফড়ফড় ফড়র-ফড়র ফটাৎ ফটাস ফড়াৎ ফড়াস ফনফন ফরফর ফস ফসফস ফসাফস ফিক ফিকফিক ফিটফাট ফিনফিন ফুটফুট ফুটফাট ফুরফুর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ফুস ফুসফুস ফুসফাস ফোঁফাঁ ফোঁফোঁ ফোঁৎফোঁৎ ফোঁচফোঁচ ফোঁস ফোঁসফোঁস ফ্যাফ্যা ফ্যাকফ্যাক ফ্যাঁচ ফ্যাঁচফ্যাঁচ ফ্যাঁচর-ফ্যাঁচর ফ্যাটফ্যাট ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে ফিনফিনে ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যালফেলে॥

বকবক বকর-বকর বজর-বজর বনবন বড়বড় বড়র-বড়র বিজবিজ বিজির-বিজির বিড়বিড় বিড়ির-বিড়ির বুগবুগ বোঁ বোঁ-বোঁ ব্যাজব্যাজ॥

ভকভক ভড়ভড় ভনভন ভুকভুক ভুটভাট ভুরভুর ভুড়ুক-ভুড়ুক ভোঁ ভোঁ-ভোঁ ভ্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ ভ্যানভ্যান। ভ্যানভেনে॥

মচ মচমচ মট মটমট মড়মড় মড়াৎ মসমস মিটমিট মিটিমিটি মিনমিন মুচ মুচমুচ ম্যাড়ম্যাড় ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে মিটমিটে মিনমিনে মিসমিসে মুচমুচে ম্যাড়মেড়ে ম্যাজমেজে॥

রী-রী রিমঝিম রিনিঝিনি রুনুঝুনু রৈরৈ রগরগে॥

লকলক লটপট লিকলিক। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে॥

সট সটসট সনসন সড়সড় সপসপ সপাসপ সরসর সিরসির সাঁ সাঁ-সাঁ সাঁইসাঁই সুট সুটসুট সুড়সুড় সুড়উৎ সোঁ-সোঁ স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁতসেতে॥

হট হটহট হটর-হটর হড়হড় হড়াৎ হড়বড় হড়র-হড়র হনহন হলহল হড়র-বড়র হাউমাউ হা-হা হাউহাউ হাঁ-হাঁ হাঁসফাঁস হিহি হিড়হিড় হু-হু হুটহাট হুড়হুড় হুড়মুড় হুড়ুৎ হুপহাপ হুস হুসহুস হুসহাস হো হো হোহো হ্যাঁহ্যাঁ (কুকুর) হ্যাটহ্যাট হ্যাৎহ্যাৎ হাপুস-হুপুস হাপুড়-হুপুড় হুড়োমুড়ি॥

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষাতেও আছে; যথা, bang thud ding-dong hiss ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাংলাভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নহে, সর্বত্রই পাওয়া যায়। ‘মিষ্ট’ বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে মিষ্ট মুখ, মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্রজাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরেজিতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সংকীর্ণ থাক্‌, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। মিষ্ট শব্দ মুখ্যত স্বাদকে বুঝাইলেও এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমত সৈন্য নহে অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলাভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমত শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলাভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্বেই আভাস দিয়াছি, বাংলাভাষায় সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশস্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে,

সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলাভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। তীরবেগে চলিয়া গেল, বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে; সাঁ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিত ভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার আর-এক সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সাঁ করিয়া গেল, এবং গটগট করিয়া গেল, উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে; অথচ উভয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচকচ করিয়া কাটা; কচাকচ কাটিয়া যাওয়া; কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাৎ করিয়া, কটাস করিয়া, ক্যাঁচ করিয়া, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া, এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কাটা সম্বন্ধে যত প্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরেজিতে গমনক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে—creep crawl sweep totter waddle ইত্যাদি। বাংলায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না; ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। খটখট করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুরখুর করিয়া, খুটুস খুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধঢ্ঢড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া—চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।

চলা কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য নহে; কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে-সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট,তাহাও বাংলাভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়; যেমন পাতলা জিনিসকে ফিনফিন ফুরফুর ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। পাতলা ফিনফিন করছে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোনো শব্দ করিতেছে, অথচ তৎদ্বারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ছিপছিপে কথাটাও ঐরূপ; সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এইজন্য ছিপছিপে লোক বস্তুত কোনো শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে-সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত; কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোনো অদ্ভুত বিশেষত্ববশত আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি; অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি; যথা, কটকট কনকন করকর (চোখের বালি) কুটকুট গা-ঘ্যানঘ্যান (বা গা-ঘিনঘিন) গা-চচ্চড় চিনচিন গা-ছমছম ঝিনঝিন দবদব ধকধক বুক-দুদ্দুড় ম্যাজম্যাজ সুড়সুড় সড়সড় রীরী। ইংরেজিতে এইরূপ শারীরিক বেদনাসকলকে- throbbing gnawing boring crawling cutting tearing bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাওয়া, কামড়ানো প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমত ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার জো নাই। ঐ-সকল ধ্বনির সহিত ঐ সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, গা মাটি মাটি করা, বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে কী তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না, অথচ, গা মাটিমাটি করা, কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাববহ।

সর্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন-কি, নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়োবাড়ি হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে—এই-সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ; ইংরেজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্তত আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য। টকটকে টুকটুকে ডগডগে দগদগে রগরগে লাল; ফুটপুটে ফ্যাটফেটে ফ্যাকফেকে ধবধবে সাদা; মিসমিসে কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থে শব্দ। যে-লাল অত্যন্ত কড়া লাল সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাতক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়।

কবির কর্ণে যেমন ‘silent spheres’ অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সংগীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর লাল আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে যে-আঘাত করে, তাহার যদি কোনো শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবত গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গবশত নিজের অর্থসম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনির দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জ্বলজ্বল শব্দ তাহার অন্যতর উদাহরণ; জ্বলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী, সেই কারণে আমরা কোনো জিনিসকে ‘জ্বলজ্বল হইতেছে’ বলি না—’জ্বলজ্বল করিতেছে’ বলি—এই করিতেছে ক্রিয়ার পূর্বে ধ্বনি শব্দ উহ্য। বাংলাভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুলকুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে শব্দ করে বলা বাহুল্য; সাদা ধবধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেতপদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে একপ্রকার অশব্দিত শব্দ করে। কোনো বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন বলি ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ত দেওয়া আমার কর্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক—সেখানে মলিন ম্লান প্রভৃতি আর-কিছু বলিয়া কুলায় না।

চিকচিক গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্‌ভূত হইয়াছে কি না, সে প্রসঙ্‌গ এ স্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনিমাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে, তাহাকে আমরা চিকচিক বলি; আমার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয় তবে তাহা নীরবে চুকচুক শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুকচুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশত তাহার জ্যোতি একবার এক দিক হইতে একবার অন্য দিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক ঝিকঝিক বা ঝলঝল না করিয়া চিকমিক ঝিকমিক ঝলমল করিতে থাকে, অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন একদিক হইতে কট এবং আর-একদিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা কাঠিন্যের ঐক্য যেন আরো পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে; ধপ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষজাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা নিযুক্ত। প্রথমত ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়, অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ঐ দলে ধরা যাইতে পারে; যথা, মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূ ধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্মী। চকচকে জিনিস স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তকতক করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জ্বলজ্বলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে হউক, তাহার আভা আছে।

বাংলাভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট হইয়া বসা, গুম হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ হইয়া যাওয়া। গট গুম এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে; যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ-ভাবের মধ্যেও একটি আবেগের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাসবোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরো যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সংকেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সংকেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সংকেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে-অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলাভাষায় এই-সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার

বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সংকেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশত সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন কর্তন পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কি না। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত; কচ এবং কট—তীক্ষ্ম অস্ত্রে ছেদন কচ, এবং গুরু অস্ত্রে কট। এই পর্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত; ক্যাঁচ খ্যাঁচ গ্যাঁচ ঘ্যাঁচ।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্যায়বিভাগে সহায়তা করিবেন এই আশা করি।

জ্যাবড়া ধ্যাবড়া অ্যাবড়া-খ্যাবড়া হিজিবিজি হাবজা-গোবজা হোমরা-চোমরা হেজিপেঁজি ঝাপসা ভ্যাবসা ঝুপসি ঢ্যাপসা হোঁৎকা গোমসা ধুমসো ঘুপসি, মটকা মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, মুষড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণনামূলক খাঁটি বাংলাশব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসংকলনে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত

প্রবন্ধ-আরম্ভে বলা আবশ্যক যে-সকল বাংলা শব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সংগত।

আজ পর্যন্ত বাংলা-অভিধান বাহির হয় নাই; সুতরাং বাংলাশব্দের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার দোষ এই যে, স্মৃতি অনেক সময় অযাচিত অনুগ্রহ করে, কিন্তু প্রার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রবন্ধে পদে পদে অসম্পূর্ণতা থাকিবে। আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধীসাধারণের উপর।

আমার পক্ষে সংকোচের আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশত বাংলাশব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাংলার দুটা-একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হই নাই। এ প্রবন্ধে পাঠকেরা আনাড়ির পরিচয় পাইবেন, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে আশা করিয়াই সাহিত্য-পরিষদে এই বাংলাভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞাতসারে পাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নূতন পরিভাষা নির্মাণের ক্ষমতা নাই, অথচ না করিলেও লেখা অসম্ভব।

এইখানে একটা পরিভাষার কথা বলি। সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসংগত হয়; কারণ সংস্কৃতভাষায় ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়, বাংলায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোনো অর্থ নাই। অতএব অন্য ভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়।

ণিজন্তের প্রকৃতি কী। তাহাতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত দুইটি কর্তা থাকে। ফল পাড়িলাম; পতন-ব্যাপারের অব্যবহিত কর্তা ফল, কিন্তু তাহার হেতু-কর্তা আমি : কারয়তি যঃ স হেতুঃ—

যে করায় সে-ই হেতু, সে-ই ণিজন্ত ধাতুর প্রথম কর্তা, এবং যাহার উপর সেই কার্যের ফল হয় সে-ই ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় কর্তা। হেতুরে একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম।

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত বাংলা ও কোন্‌গুলি সংস্কৃত, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্‌ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্‌ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন্‌ হয় না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, কিন্তু তাহা শতৃপ্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদিরূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে-সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলা-প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত রঞ্জিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে,কিন্তু বাংলায় ত প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই, সেইজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না; অতএব ত প্রত্যয় বাংলা-প্রত্যয় নহে।

হিন্দি পারসি প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে-সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমার ঐ একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবত হিন্দি বা পারসি; কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাঁকসই প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ওয়ান প্রত্যয় সেরূপ নহে। গাড়োয়ান দারোয়ান পালোয়ান শব্দ আমরা হিন্দি হইতে বাংলায় পাইয়াছি, প্রত্যয়টি পাই নাই।

অর্থাৎ যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনোপ্রকার আদানপ্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।

যে-সকল কৃৎতদ্ধিতের সাহায্যে বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়, বর্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ থাকিবে। ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা, চলা বলা সাঁৎরানো বাঁচানো ইত্যাদি। পদার্থবাচক যথা, হাতি ঘোড়া জিনিসপত্র ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন হয় নাই। অ প্রত্যয়

এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়; যথা, কট্‌মট্‌ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইয়া কটমট (কটমট ভাষা, কটমট দৃষ্টি), টল্‌মল্‌ হইতে টলমল।

আসন্নপ্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে-বিশেষণ হয় তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা পড়্‌ ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্‌ ধাতু হইতে পাক-পাক, মর্‌ ধাতু হইতে মর-মর, কাঁদ্‌ ধাতু হইতে কাঁদে কাঁদ। অন্য অর্থে হয় না; যথা, কাটাকাটা (কথা), পাকাপাকা ছাড়াছাড়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলা ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খাস বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে। বাংলা-উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে ‘ভাল’ শব্দ ভাল্‌ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা অকারান্ত উচ্চারণ করি। বস্তুত বাংলায় অকারান্ত বিশেষ্য পদ অতি অল্পই দেখা যায়, অধিকাংশই বিশেষণ; যথা, বড় ছোট মাঝ (মাঝো মেঝো) ভাল কাল খাট (ক্ষুদ্র) জড় (পুঞ্জীকৃত) ইত্যাদি।

বাকি অনেকগুলো বিশেষণই আকারান্ত; যথা, কাঁচা পাকা বাঁকা তেড়া সোজা সিধা সাদা মোটা নুলা বোবা কালা ন্যাড়া কানা তিতা মিঠা উঁচা বোকা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়

পূর্বোক্ত আকারান্ত বিশেষণগুলিকে আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া অনুমান করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাংলায় বিশেষণ হইবার সময় কানা হইল, মৃত হইতে মড়া হইল, মহৎ হইতে মোটা হইল, সিত হইতে সাদা হইল। এই আকারগুলি উচ্চারণের নিয়মে আপনি আসে নাই। বিশেষণে হলন্ত প্রয়োগ বর্জন করিবার একটা চেষ্টা বাংলায় আছে বলিয়াই যেখানে সহজে অন্য কোনো স্বরবর্ণ জোটাইতে পারে নাই, সেই-সকল স্থলে আ প্রত্যয় যোগ করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার ‘স্বার্থে ক’ বাংলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘোটক ঘোড়া, মস্তক মাথা, পিষ্টক পিঠা, কণ্টক কাঁটা, চিপিটক চিঁড়া, গোপালক গোয়ালা, কুল্যক কুলা।

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই; যেমন তক্ত তক্তা, বাঘ বাঘা, পাট পাটা, ল্যাজ ল্যাজা, চোঙ চোঙা, চাঁদ চাঁদা, পাত পাতা, ভাই ভাইয়া (ভায়া), বাপ বাপা, থাল থালা, কালো কালা, তল তলা, ছাগল ছাগ্‌লা, বাদল বাদ্‌লা,

পাগল পাগ্‌লা, বামন বাম্‌না, বেল (ফুল) বেলা, ইলিশ ইল্‌শা (ইল্‌শে)।

এই আ প্রত্যয়যোগে অনেকস্থলে অবজ্ঞা বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করে, বিশেষত মানুষের নাম সম্বন্ধে;

যথা, রাম রামা, শাম শামা, হরি হরে (হরিয়া), মধু মোধো (মধুয়া), ফটিক ফট্‌কে (ফট্‌কিয়া)।

দ্রষ্টব্য এই যে, সকল নামে আ প্রত্যয় হয় না; যাদবকে যাদ্‌বা, মাধবকে মাধ্‌বা বলে না। শ্রীশ, প্রিয়, পরান প্রভৃতিও এইরূপ। বাংলা নামের বিকার সম্বন্ধে কোনো পাঠক আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে আনন্দিত হইব।

স্বার্থে আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া গেছে, তাহাতে অর্থের পরিবর্তন হয় না। আবার, আ প্রত্যয়ে অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটে এমন উদাহরণও আছে; যেমন, হাত হইতে হাতা (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা, অর্থাৎ হাতের মতো পদার্থ) ঠ্যাঙ হইতে ঠ্যাঙা (ঠ্যাঙের ন্যায় পদার্থ) ভাত হইতে ভাতা (খোরাকি), বাস হইতে বাসা, ধোব হইতে ধোবা, চাষ হইতে চাষা।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়; বাঁধ্‌ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া বাঁধা, ঝর্‌ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ঝরা। ইহারা বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ যেমন, বাঁধা হাত; বিশেষ্য যেমন, হাত বাঁধা।

দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ mono-syllabic ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে; যেমন ধর্‌ মার্‌ চল্‌ বল্‌ হইতে ধরা মারা চলা বলা। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না; যেমন, আঁচড় হইতে আঁচ্‌ড়া আছাড় হইতে আছড়া হয় না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিশেষণরূপে হইতে পারে; যেমন, থ্যাঁৎলা মাংস, কোঁক্‌ড়া চুল, বাঘ-আঁচ্‌ড়া গাছ নেই-আঁক্‌ড়া লোক (ন্যায়-আঁক্‌ড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল। আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দুই-একটি মনে পড়িতেছে; তাওয়া (যাহাতে রুটিতে তা দেওয়া যায়), দাওয়া (দাবি, অর্থাৎ দাও বলিবার অধিকার), আছ্‌ড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে)।

বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হইয়া থাকে; যথা তেলবিশিষ্ট তেলা, বেতালবিশিষ্ট বেতালা, বেসুরবিশিষ্ট বেসুরা,

জলময় জলা, নুনবিশিষ্ট নোনা (লবণাক্ত), আলোকিত আলা, রোগযুক্ত রোগা, মলযুক্ত ময়লা, চালযুক্ত চালা

(ঘর), মাটিযুক্ত মাটিয়া (মেটে), বালিযুক্ত বালিয়া (বেলে), দাড়িযুক্ত দাড়িয়া (দেড়ে)। বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয়; যথা, হাঁড়া (ক্ষুদ্র, হাঁড়ি); নোড়া (লোষ্ট্র হইতে; ক্ষুদ্র, নুড়ি)।

আন্ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত: যোগান্ চাপান্ চালান্ জানান্ হেলান্ ঠেসান্ মানান্। এগুলি ছাড়া একপ্রকার বিশেষ পদবিন্যাসে এই আন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ঠকা হইতে ঠকান্ শব্দ বাংলায় সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আমরা বলি, ভারি ঠকান্ ঠকেছি, অথবা, কী ঠকান্‌টাই ঠকিয়েছে। সেইরূপ, কী পিটানটাই পিটিয়েছে, কী ঢলান্‌টাই ঢলিয়েছে, এরূপ বিস্ময়সূচক পদবিন্যাসের বাহিরে পিটান্ ঢলান্ ব্যবহার হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পদার্থবাচকের দৃষ্টান্‌তও আছে; যথা, বানান্ উঠান্ উনান্ উজান্ (ঊর্ধ্ব-উঝ +আন্) ঢালান্ (জলের) মাচান্ (মঞ্চ)।

আন্ + অ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ অ প্রত্যয় করিয়া বাংলায় অনেকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়।

পূর্বে দেখানো গিয়াছে, একমাত্রিক ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়াবাচক দুই-অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সিদ্ধ হয়; যেমন, ধরা মারা ইত্যাদি।

বহুমাত্রিকে আ প্রত্যয় না হইয়া আন্ ও তদুত্তরে অ প্রত্যয় হয়; যেমন, চুল্‌কান (উচ্চারণ চুলকানো) কাম্‌ড়ান (কামড়ানো) ছটফটান (ছটফটানো) ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত নৈমিত্তিক ক্রিয়াপদকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত করিতে আন্ + অ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন করা শব্দ হইতে নৈমিত্তিক অর্থে করান, বলা হইতে বলান।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও দেখা যায়; যেমন পড়া হইতে নৈমিত্তিক পাড়া, চলা হইতে চালা, গলা হইতে গালা, নড়া হইতে নাড়া, জ্বলা হইতে জ্বালা, মরা হইতে মারা, বহা হইতে বাহা, জরা হইতে জারা।

কিন্তু পড়া হইতে পড়ান, নড়া হইতে নড়ান, চলা হইতে চলান, ইহাও হয়। এমন কি, নৈমিত্তিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ চালা নাড়া পাড়া প্রভৃতির উত্তর পুনশ্চ আন্+অ যোগ করিয়া চালান পাড়ান নাড়ান হইয়া থাকে।

কিন্তু তাকান গড়ান (বিছানায়) আঁচান প্রভৃতি অনৈমিত্তিক শব্দ সম্বন্ধে কী বুঝিতে হইবে। তাকা গড়া আঁচা, হইল না কেন।

তাহার কারণ, এইগুলির মূল ধাতু একমাত্রিক নহে। দেখ্, একমাত্রিক ধাতু, তাহা হইতে 'দেখা' হইয়াছে; কিন্তু তাকান শব্দের মূল ধাতুটি তাক্ নহে, তাহা তাকা, সেইজন্যই উক্তধাতুকে বিশেষ্য করিতে আন্+অ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। নামধাতুগুলিও আন্+অ প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে; যেমন, লাথ্ হইতে লাথান, পিঠ্ হইতে পিঠান (পিটোনো), হাত হইতে হাতান।

মূল ধাতু বহুমাত্রিক কি না, তাহার পরীক্ষার অন্য উপায় আছে। অনুজ্ঞায় আমরা দেখ্ ধাতুর উত্তর 'ও' প্রত্যয় করিয়া বলি, দেখো, কিন্তু তাকো বলি না; তাকা ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি তাকাও। গঠন করো, বলিতে হইলে গড়্ ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়ো, কিন্তু, শয়ন করো, বুঝাইতে হইলে গড়া ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়াও।

আমাদের বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি আকারান্ত, সেইজন্য পুনশ্চ তাহার উত্তর আ প্রত্যয় না হইয়া আন্+অ প্রত্যয় হয়। মূল শব্দটি আট্‌কা বা চম্‌কা না হইলে অনুজ্ঞায় আট্‌কাও হইত না, চম্‌কাও হইত না। হিন্দিতে পাকড়্ শব্দের উত্তর ও প্রত্যয় হইয়া পাকড়ো হয়; সেই শব্দই বাংলায় পাক্‌ড়া রূপ ধরিয়া পাকড়াও হইয়া দাঁড়ায়।

অন্ প্রত্যয়

দৃষ্টান্ত : মাতন্ চলন্ কাঁদন্ গড়ন্ (গঠনক্রিয়া) ইত্যাদি। ইহারা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ। অন্ প্রত্যয়সিদ্ধ পদার্থবাচক শব্দের উদাহরণও মনে পড়ে; যেমন, ঝাড়ন্ বেলুন্ (রুটি বেলিবার) মাজন্ গড়ন্ (শরীরের) ফোড়ন্ ঝোঁটন্ (ঝুঁটি হইতে) পাঁচন্।

অন +আ প্রত্যয়

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ আ প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে; ইহারা বিকল্পে বিশেষ্যও হয়; যেমন, পাওন্ হইতে পাওনা, দেওন্ হইতে দেনা, ফেলন্ হইতে ফেল্‌না, মাগন্ হইতে মাগ্‌না, শুকন্ হইতে শুক্‌না।

পদার্থবাচক বিশেষ্যেরও দৃষ্টান্ত আছে; যেমন, বাট্‌না কুট্‌না ওড়্‌না ঝরনা খেলনা বিছানা বাজ্‌না ঢাক্‌না।

ই প্রত্যয়

ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে : গোলাপি বেগুনি চালাকি চাকরি চুক্তিডাক্তারি মোক্তারি ব্যারিস্টারি মাস্টারি; খাড়াই (খাড়া পদার্থের ধর্ম) লম্বাই চৌড়াই ঠাণ্ডাই আড়ি (আড় অর্থাৎ বক্র হইবার ভাব)।

অনুকরণ অর্থে : সাহেবি নবাবি।

দক্ষ অর্থে : হিসাবদক্ষ হিসাবি, আলাপদক্ষ আলাপি, ধ্রুপদদক্ষ ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে : দামবিশিষ্ট দামি, দাগবিশিষ্ট দাগি, রাগবিশিষ্ট রাগি, ভারবিশিষ্ট ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে : হাঁড়ি পুঁটুলি কাঠি (ইহাদের বৃহৎ—হাঁড়া পোঁটলা কাঠ)।

দেশীয় অর্থে : মারাঠি গুজরাটি আসামি পাটনাই বস্‌রাই।

স্বার্থে : হাস হাসি, ফাঁস ফাঁসি, লাথ লাথি, পাড় (পুকুরের) পাড়ি, কড়া কড়াই (কটাহ)।

দিননির্দেশ অর্থে : পাঁচই ছউই সাতই আটই নওই দশই, এরূপে আঠারই পর্যন্ত।

আ+ই প্রত্যয়

ক্রিয়াবাচক : বাছাই যাচাই দলাই-মলাই (ঘোড়াকে) খোদাই ঢালাই ধোলাই ঢোলাই বাঁধাই পালটাই।

পদার্থবাচক : মরাই (ধানের) বালাই (বালকের অকল্যাণ) মিঠাই।

মনুষ্যের নাম : বলাই কানাই নিতাই জগাই মাধাই।

ধর্ম : বড়াই (বড়ত্ব) বামনাই পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম)।

ই+আ প্রত্যয়

জাল শব্দ ই প্রত্যয়যোগে জালি, স্বার্থে আ—জালিয়া (জেলে)। এইরূপ, কোঁদলিয়া (কুঁদুলে) জঞ্জালিয়া (জঞ্জুলে) গোবরিয়া (গুবরে), স্যাঁৎস্যাঁতিয়া (স্যাঁৎসেঁতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়

চালু (চলনশীল) ঢালু (ঢাল-বিশিষ্ট) নিচু (নিম্নগামী) কলু (ঘানিকল-বিশিষ্ট), গাড়ু (গাগর শব্দ হইতে গাগরু) আগুপিছু (অগ্রবর্তী-পশ্চাদ্বর্তী)।

মানুষের নাম : যাদব হইতে যাদু, কালা হইতে কালু, শিব হইতে শিবু, পাঁচকড়ি হইতে পাঁচু।

উ+আ প্রত্যয়

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো) জাঁকুয়া (জেঁকো) বাতুয়া (বেতো) পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে : মাছুয়া (মেছো), বুনুয়া (বুনো), ঘরুয়া (ঘোরো) মাঠুয়া (মেঠো)।

নির্মিত অর্থে : কাঠুয়া (কেঠো) ধানুয়া (ধেনো)।

আ+ও প্রত্যয়

ঘেরাও চড়াও উধাও ফেলাও (ফলাও)।

ও + আ প্রত্যয়

বাঁচোয়া ঘরোয়া চড়োয়া ধরোয়া আগোয়া।

অন্ + ই প্রত্যয় মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় কেবল একমাত্রিক ধাতুতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন, ধর্ হইতে ধর্‌না (ধন্না), কাঁদ্ হইতে কাঁদনা (কান্না)। কিন্তু বহুমাত্রিক শব্দের উত্তর এরূপ হয় না। আমরা কামড়ানা কটকটানা বলি না, তাহার স্থলে কামড়ানি কটকটানি বলিয়া থাকি; অর্থাৎ অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় না করিয়া ই প্রত্যয় করিয়া থাকি।

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর ই প্রত্যয় একমাত্রিকেও হয়; যথা, মাতনি (মাতুনি) বাঁধনি (বাঁধুনি) জ্বলনি (জ্বলুনি) কাঁপনি (কাঁপুনি) দাপনি (দাপুনি) আঁটনি (আঁটুনি)।

মূল ধাতুটি হলন্ত কিংবা আকারান্ত, তাহা এই অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে জানা যাইতে পারে। তাকনি না হইয়া তাকানি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে মূল ধাতুটি তাকা। এইরূপ, আছড়া চট্কা কাম্‌ড়া ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয়ভাব ব্যক্ত করে; যথা, বকুনি ধমকানি চমকানি হাঁপানি শাসানি টাটানি নাকানি-চোবানি কাঁদুনি জ্বলুনি কাঁপুনি ফোঁস্‌লানি ফোঁপানি গোঙানি ঘ্যাঙানি খ্যাঁচ্‌কানি কোঁচকানি (ভুরু) বাঁকানি (মুখ) খিঁচুনি (দাঁত) খ্যাঁকানি ঘস্‌ড়ানি ঘুরুনি (চোখ) চাপুনি চেঁচানি ভ্যাঙানি (মুখ) রগড়ানি রাঙানি (চোখ) লাফানি ঝাঁপানি।

ব্যাতিক্রম : বাঁধুনি (কথার) শুনানি দুলুনি বুনুনি (কাপড় বা ধান) বাছনি (বাছাই)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে যেগুলি অসুখব্যঞ্জক তাহার উত্তরেই অন্+ই প্রত্যয় হয়; যথা, দব্‌দবানি ঝন্‌ঝনানি কন্‌কনানি টন্‌টনানি ছট্‌ফটানি কুট্‌কুটুনি ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার কয়েকটি পদার্থবাচক বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয়; দৃষ্টান্ত, ছাঁকনি নিড়নি চালুনি বিননি (চুলের) চাট্নি ছাউনি নিছনি তলানি (তরলপদার্থের তলায় যাহা জন্মে)।

ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ : রাঁধুনি (ব্রাহ্মণ) ঘুম-পাড়ানি পাট-পচানি ইত্যাদি।

না প্রত্যয়

না প্রত্যয়যোগে বর্ণের বিশেষ পরিবর্তন হয় না; পাখা, পাখনা, জাব (গরুর) জাবনা, ফাতা (ছিপের) ফাৎনা, ছোট ছোটনা (ধান)।

আনা প্রত্যয়

বাবুয়ানা সাহেবিয়ানা নবাবিয়ানা মুন্সিয়ানা। ই প্রত্যয় করিয়া হিঁদুয়ানি।

ল্ প্রত্যয়

কাঁক্ড়োল (কাঁকুড় হইতে) হাবল খাবল পাগল পাকল (পাক অর্থাৎ ঘূর্ণাবিশিষ্ট) হাতল মাতল (মত্ত হইতে মাতা)।

র্ প্রত্যয়

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র্ প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায়; যথা, গজ্গজ্ হইতে গজর্ গজর্, বক্বক্ হইতে বকর্ বকর্, নড়্বড়্ হইতে নড়র্ বড়র্, কট্মট্ হইতে কটর্ মটর্, ঘ্যান্ঘ্যান্ হইতে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুটকুট হইতে কুটুর্ কুটুর্।

আল্ প্রত্যয়

দয়াল্ কাঙাল্ (কাঙ্ক্ষালু) বাচাল্ আঁঠিয়াল্ আড়াল মিশাল।

ল+আ

মেঘলা বাদলা পাতলা শামলা আধলা ছ্যাৎলা একলা দোকলা চাকলা।

ল+ই+আ

দীঘলিয়া (দীঘ্লে) আগলিয়া (আগ্লে) পাছলিয়া (পাছ্লে) ছুটলিয়া (ছুট্লে)।

আড়্

জোগাড় লাগাড় (নাগাড়) সাবাড় লেজুড় খেলোয়াড় উজাড়।

আড় +ই+আ

বাসাড়িয়া (বাসাড়ে) জোগাড়িয়া (জোগাড়ে) মজাড়িয়া (মজাড়ে) হাতাড়িয়া (হাতুড়ে, যে হাতড়াইয়া বেড়ায়) কাঠুরে হাটুরে ঘেসুড়ে রা ও ড়া

টুকরা চাপড়া ঝাঁকড়া পেটরা চামড়া ছোকরা গাঁঠরা ফোঁপরা ছিবড়া থাবড়া বাগড়া খাগড়া।

বহু অর্থে: রাজারাজড়া গাছগাছড়া কাঠকাঠরা।

আরি

জুয়ারি কাঁসারি চুনারি পূজারি ভিখারি।

আরু

সজারু (শল্যবিশিষ্ট জন্তু) লাফারু (কোনো কোনো প্রদেশে খরগোসকে বলে) দাবাড়ু (দাবা খেলায় মত্ত)।

ক্

মড়ক চড়ক মোড়ক বৈঠক চটক ঝলক চমক আটক।

আক্ উক্ ইক্

ফাঁসুড়ে চাষাড়ে।

রা ও ড়া

এই-সকল প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়ার বিশেষণগুলি হয় তাহাতে দ্রুতবেগ বুঝায়; যথা, ফুড়ুক্ তিড়িক্ তড়াক্ চিড়িক্ ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক্ +আ

মট্‌কা বোঁচ্‌কা হাল্‌কা বোঁট্‌কা হোঁৎকা উচক্‌কা। ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় করিয়া মট্‌কি, বুঁচ্‌কি ইত্যাদি হয়।

ক্+ ই+আ

শুট্‌কিয়া (শুট্‌কে) পুঁটকিয়া (পুঁট্‌কে) পুঁচকিয়া (পুঁচ্‌কে) ফচ্‌কিয়া (ফচ্‌কে) ছোট্‌কিয়া (ছুট্‌কে)।

উক্

মিথ্যুক লাজুক মিশুক।

গির্+ ই

গির্ প্রত্যয়টি বাংলায় চলে নাই। তাগাদ্‌গির প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশী। কিন্তু এই গির্ প্রত্যয়ের সহিত ই প্রত্যয় মিশিয়া গিরি প্রত্যয় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্বত্র হয় না। কামারের ব্যবসায়কে কেহ কামারি বলে না, বলে কামারগিরি। এই গির্‌+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়; অ্যাটর্নিগিরি স্যাকরাগিরি মুচিগিরি মুটেগিরি।

অনুকরণ অর্থে : বাবুগিরি নবাবগিরি।

দার্‌

দোকানদার চৌকিদার রঙদার বুটিদার জেল্লাদার যাচনদার চড়নদার ইত্যাদি। ইহার সহিত ই প্রত্যয় যুক্ত হইয়া দোকানদারি ইত্যাদি বৃত্তিবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি হয়।

দান্‌

বাতিদান পিকদান শামাদান আতরদান। স্বার্থে ই প্রত্যয়যোগে বাতিদানি পিকদানি আতরদানি হইয়া থাকে।

সই

হাতসই মাপসই প্রমাণসই মানানসই ট্যাঁকসই।

পনা

বুড়াপনা ন্যাকাপনা ছিব্‌লেপনা গিন্নিপনা।

ওলা বা ওয়ালা

কাপড়ওয়ালা ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর

এমনতর যেমনতর কেমনতর

অৎ

মানৎ বসৎ ঘুরৎ ফেরৎ গলৎ (গলদ)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয়ে দ্রুতবেগ বুঝায় : সড়াৎ ফুড়ৎ পটাৎ খটাৎ।

অৎ+আ

ধর্‌তা ফেরতা পড়্‌তা জান্‌তা (সবজান্তা)।

তা

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : পান্‌তা নোন্‌তা তল্‌তা (তরল্‌তা,তরল বাঁশ)। আওতা নাম্‌তা শব্দের বুৎপত্তি বুঝা যায় না।

অৎ+ই

ফির্‌তি চল্‌তি উঠ্‌তি বাড়্‌তি পড়্‌তি চুক্‌তি ঘাঁট্‌তি গুন্‌তি।

অৎ+আ+ই

খোল্‌ তাই ধর্‌ তাই।

অন্ত

জিয়ন্ত ফুটন্ত চলন্ত।

মন্ত

লক্ষ্মীকান্ত বুদ্ধিমন্ত আক্কেলমন্তা

অন্‌ দা(?)

বাসন্দা (অধিবাসী) মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন)। বলা উচিত এ-প্রত্যয়টির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই।

ট

চাপট্‌ (চৌচাপট্‌) সাপট্‌ ঝাপট্‌ দাপট্‌।

ট্‌+ই

চিম্‌টি।

ট্ট

ভরট্ট (নদীভরট্ট, খালভরট্ট জমি)।

আ+ট্‌

জমাট্‌ ভরাট্‌ ঘেরাট্‌।

টা

চ্যাপটা ল্যাঙ্‌টা ঝাপ্‌টা ল্যাপ্‌টা চিম্‌টা শুক্‌টা।

আট্‌+ই+আ

রোগাটিয়া (রোগাটে) বোকাটিয়া (বোকাটে) তামাটিয়া (তামাটে) ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে) ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে) বামন্‌টিয়া (বেঁটে)।

অং আং ইং

ভড়ং ভুজং-ভাজাং চোং (নল) খোলাং (খোলাং কুচি) তিড়িং। বড়াং, কোনো কোনো জেলায় অহংকার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে।

অঙ্গা আঙ্গা অঙ্গিয়া

সুড়ঙ্গা সুড়ঙ্গি সুড়ুঙ্গে কুলঙ্গি ধিঙ্গি ধেড়েঙ্গে বিরিঙ্গি (বৃহৎ পরিবারকে কোনো কোনো প্রদেশে ‘বিরিঙ্গি গুষ্টি’ বলে)।

চ চা চি

আল্‌গচ (আলগা ভাব) ল্যাংচা (খোঁড়ার ভাব) ভ্যাংচা (ব্যঙের ভাব) ভাংচি খিম্‌চি ঘামাচি ত্যাড়্‌চা (তির্যকভাব)। আধার অর্থে : ধুনচি ধুপচি খুঞ্চি চিলিম্‌চি খাতাঞ্চি মশাল্‌চি।

ক্ষুদ্র অর্থে : ব্যাঙাচি নলচি (হুঁকার) কঞ্চি কুচি; মোচা (কলার মোচা, মুকুলচা হইতে মোচা); মোচার ক্ষুদ্র মুচি।

অস্‌

খোলস্‌ মুখস্‌ তাড়স্‌ ঢ্যাপস্‌।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অস্‌ প্রত্যয়ে স্থূলতা ও ভার বুঝায়—ধপ্‌ হইতে ধপাস্‌; ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, ধড়াস্‌ করিয়া পড়া—অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া পড়া; খট্‌ এবং খটাস্‌, পট্‌ এবং পটাস্‌ শব্দের সূক্ষ্ম অর্থভেদ নির্দেশ করিতে গেলে পাঠকদের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করি।

সা

চোপ্‌সা গোম্‌সা ঝাপ্‌সা ভাপ্‌সা চিম্‌সা পান্‌সা ফেন্‌সা এক্‌লা খোলসা মাকড়্‌সা কাল্‌সা।

সা+ইয়া

ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে), লাল্‌চে সম্ভবত লাল্‌সে কথার বিকার, কাল্‌সিটে-কাল+সা+ইয়া+টা = কাল্‌সিয়াটা কাল্‌সিটে।

আম

অনুকরণ অর্থে : বুড়ামো ছেলেমো পাগ্‌লামো জ্যাঠামো বাঁদরামো।

ভাব অর্থে : মাত্‌লামো, ঢিলেমো আল্‌সেমো।

আম+ই

বুড়ামি মাত্‌লামি ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গে ই

ছুঁড়ি ছুক্‌রি বেটি খুড়ি মাসি পিসি দিদি পাঁঠি ভেড়ি বুড়ি বাম্‌নি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি

কলুনি তেলিনি গয়লানি বাঘিনি মালিনি ধোবানি নাপ্‌তিনি কামার্‌নি চামার্‌নি পুরুত্‌নি
মেত্‌রানি তাঁতনি ঠাকুরানি চাক্‌রানি
উড়েনি কায়েত্‌নি খোট্টানি মুসলমান্‌নি জেলেনি।

বাংলা কৃৎ তদ্ধিত আমার যতগুলি মনে পড়িল লিখিলাম। নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে; সেগুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, ততই কাজে লাগিবে।

প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করাও বাকি রহিল। এ সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার হ্যর্নলে-রচিত Comparative Grammar of the Gaudian Languages পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন।

প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ করিয়াছেন, প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়। তাহারা কেন যে কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মন্ত প্রত্যয় কেনই-বা আক্কেল শব্দকে আশ্রয় করিয়া আক্কেলমন্ত হইবে, অথচ চালাকি শব্দের সহযোগে চালাকিমন্ত হইতে পারিল না, তাহা কে বলিবে। নি যোগে বহুতর বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে-কোমারনি খোট্টানি ইত্যাদি। কিন্তু বদ্যিনি (বৈদ্য-স্ত্রী) কেহ তো বলে না; উড়েনি বলে, কিন্তু পঞ্জাবিনী বা শিখিনি বা মগিনি বলে না। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুরনি বেড়ালনি হয় না। প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়। পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঠি হয়, মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ-সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য।

কোন্ প্রত্যয়যোগে শব্দের কী প্রকার রূপান্তর হয় তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া লেখা আবশ্যক। নিতান্তই সময়াভাববশত আমি সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় দেড়ে; ঢোল শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় ঢুলো; মধু শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় মোধো; লুন্ শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় লোনা; জ্বল্ শব্দের উত্তর অন+ই প্রত্যয় করিলে হয় জ্বলুনি, কোঁদল শব্দের উত্তর ই+আ প্রত্যয় করিলে হয় কুঁদুলে।

কতকগুলি প্রত্যয় আমি আনুমানিক ভাবে দিয়াছি। সেগুলিকে প্রত্যয় বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু শব্দ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রমাণ করিতে পারি নাই। যেমন, অং প্রত্যয়; ভুজং ভড়ং প্রভৃতি শব্দের অং বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা বাংলায় চলিত নাই। ভড় শব্দ নাই বটে, কিন্তু ভড়্কা আছে, ভড়ং এবং ভড়কের অর্থসাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, ভড় বলিয়া একটা আদিশব্দ ছিল, তাহার উত্তরে অক্ করিয়া ভড়ক্ ও অং করিয়া ভড়ং হইয়াছে। বড়াং শব্দে এই মত সমর্থন করিবে। আমার কাল্‌না-প্রদেশীয় বন্ধুগণ বলেন, তাঁহারা বড়াই শব্দের স্থলে বড়াং সর্বদাই ব্যবহার করেন; তাহাতে বুঝা যায় বড়ো শব্দের উত্তর যেমন আ+ই প্রত্যয় করিয়া বড়াই হইয়াছে, তেমনই আং প্রত্যয় করিয়া বড়াং হইয়াছে—মূল শব্দটি বড়ো, প্রত্যয় দুইটি আই ও আং।

প্রত্যয়গুলি কী ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহাও বিচারের দ্বারা ক্রমশ স্থির হইতে পারিবে। যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ-বর্জিত, সা প্রত্যয় স+আ অথবা সা, এ-সমস্ত নির্ণয় করিবার ভার ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতদের উপর নিক্ষেপ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভাষার ইঙ্গিত

বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলাভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজী হইবে তবু বস্ত্র ত্যাগ করিতে রাজী হইবে না, তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃত ব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনই আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ মাত্র থাকে। এরূপ বেনামিতে বিদ্যালাভ ভালো কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলাভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।

এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

সেই ভেদগুলি ঠিক হইয়া গেলে ঐক্যগুলি কি বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলাভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলাভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।

ভাষার অমুক ব্যবহার বাংলার পশ্চিমে আছে পূর্বে নাই বা পূর্বে আছে পশ্চিমে নাই, এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্বেই আভাস দিয়াছি, ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলাভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না; আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গি থাকে, এমনই করিয়া কাজ চালাইতে হয়। কতকটা অর্থ এবং কতকটা ইঙ্গিতের উপরে আমরা নির্ভর করি।

আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইশারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে-সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না, তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত-বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত-বাক্যগুলি অভিধানব্যাকরণের বাহিরে বাস করে, কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে নহিলে চলে না।

বাংলাভাষায় এই ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর-কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।

যে-সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোনো অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে, তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে; যেমন ধাঁ সাঁ চট্ খট্ ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনির অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সকল সময় বাস্তবধ্বনির অনুকরণ নহে, অনেক সময় ধ্বনির কল্পনামাত্র। মাথা দব্‌দব্‌ করিতেছে, টন্‌টন্‌ করিতেছে. কন্‌কন্‌ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে বেদনাবোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্‌ করিতেছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয় এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না; এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিসকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগুণসম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয়, কিন্তু, লাল টুক্‌টুক করিতেছে বলিলে সেই লাল রঙ আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত, ইহা বোবার ভাষা।

বাংলাভাষায় এইরূপ অনির্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলকশব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রঙ লইয়া বসিলে চলে না, নানা রকমের মিশ্র রঙ, সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরেজিভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন, walk run hobble waggle wade creep crawl ইত্যাদি; বাংলা লিখিত ভাষায় কেবল দ্রুতগতি ও মন্দগতি দ্বারা এই-সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কথিত ভাষা লিখিত ভাষার মতো বাবু নহে, তাহাকে যেমন করিয়া হউক প্রতিদিনের নানান কাজ চালাইতে হয়; যতক্ষণ বোপদেব পাণিনি অমরকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম আসিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া না দেন ততক্ষণ কাত হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহার চলে না; তাই সে নিজের বর্ণনার ভাষা নিজে বানাইয়া লইয়াছে, তাই তাহাকে কখনো সাঁ করিয়া, কখনো গট্‌গট্‌ করিয়া, কখনো খুটুস্‌ খুটুস্‌ করিয়া, কখনো নড়বড় করিতে করিতে, কখনো সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া, কখনো থপ্‌ থপ্‌ এবং কখনো থপাস্‌ থপাস্‌ করিয়া চলিতে হয়। ইংরেজিভাষা laugh, smile, grin, simper, chukle করিয়া নানাবিধ আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশ করে; বাংলাভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া, ফিক্‌ করিয়া এবং মুচ্‌কিয়া হাসে। মুচকে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান শব্দের অর্থ বাঁকান,

বাঁকাইতে গেলে যে মচ্‌ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচকাইয়া রাখিলে তাহা মুচকে হাসিরূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে।

বাংলাভাষার এই শব্দগুলি প্রায়ই জোড়াশব্দ। এগুলি জোড়াশব্দ হইবার কারণ আছে। জোড়াশব্দে একটা কালব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধূধূ করিতেছে ধবধব করিতেছে, বলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল নাই; যেমন, ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি।

যখন ধাঁ ধাঁ সাঁ সাঁ, বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনরাবর্তন বুঝায়।

‘এ’ প্রত্যয় যোগ করিয়া এই-জাতীয় শব্দগুলি হইতে বিশেষণ তৈরি হইয়া থাকে; যেমন, ধব্‌ধবে টক্‌টকে ইত্যাদি।

টকটক ঠকঠক প্রভৃতি কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাঝখানে আকার যোগ করিয়া উহারই মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটানো হইয়া থাকে; যেমন, কচাকচ কটাকট কড়াক্কড় কপাকপ খচাখচ খটাখট খপাখপ গপাগপ ঝনাজ্‌ঝন টকাটক টপাটপ ঠকাঠক ধড়াধ্বড় ধপাধপ, ধমাধ্বম পটাপট ফসাফস।

কপকপ এবং কপাকপ, ফসফস এবং ফসাফস, টপটপ এবং টপাটপ শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র আকারযোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, তাহা কোনো বিদেশীকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে বোঝানো শক্ত। ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক করিয়া তাহার পরে বলসঞ্চয়পূর্বক পুনর্বার দ্বিতীয়বার ঠক করা; মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকার যোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলাভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের মতো ব্যবহার করিয়াছে। সে সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সে-ই তাহার সূক্ষ্মতম মর্মটুকু বুঝিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে লক্ষ করিবার বিষয় আর-একটি আছে। আদ্যক্ষরে যেখানে অকার আছে সেইখানে পরবর্তী অক্ষরে আকার-যোজন চলে, অন্যত্র নহে।

যেমন টকটক হইতে টকাটক হইয়াছে, কিন্তু টিকটিক হইতে টিকাটিক বা ঠুকঠুক হইতে ঠুকাঠুক হয় না। এইরূপে মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, বাংলাভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলির কতকগুলি কঠিন বিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর-এক জায়গায় প্রয়োগ করিলে আর-এক রকমের সুর বাহির হয়; তাহার দৃষ্টান্ত, টুকটাক ঠুকঠাক খুটখাট ভুটভাট দুড়দাড় কুপকাপ গুপগাপ ঝুপঝাপ টুপটাপ ধুপধাপ হুপহাপ দুমদাম ধুমধাম ফুসফাস হুসহাস।

এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট। যখন বলি, টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

আমরা এতক্ষণ যে-সকল জোড়াকথার দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম তাহারা বিশুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক। আর-একরকমের জোড়াকথা আছে তাহার মূলশব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূলশব্দেরই অর্থবিহীন বিকার; যেমন, চুপচাপ ঘুষঘাষ তুকতাক ইত্যাদি। চুপ ঘুষ এবং তুক এ-তিনটে শব্দ আভিধানিক, ইহারা অর্থহীন ধ্বনি নহে; ইহাদের সঙ্গে চাপ ঘাষ ও তাক, এই তিনটে অর্থহীন শব্দ শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের কাজ করিতেছে।

জলের ধারেই যে-গাছটা দাঁড়াইয়া আছে সেই গাছটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংলগ্ন বিকৃত ছায়াটাকে একত্র করিয়া দেখিলে যেমন হয়, বাংলাভাষার এই কথাগুলাও সেইরূপ; চুপ কথাটার সঙ্গে তাহার একটা বিকৃত ছায়া যোগ করিয়া দিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ইহাতে অর্থেরও একটু অনির্দিষ্টভাবের বিস্তৃতি হইল। যদি বলা যায় কেহ চুপ করিয়া আছে, তবে বুঝায় সে নিঃশব্দ হইয়া আছে; কিন্তু যদি বলি চুপচাপ আছে, তবে বুঝায় লোকটা কেবলমাত্র নিঃশব্দ নহে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াও আছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়াকথার কাজ।

ছায়াটা আসল জিনিসের চেয়ে বড়োই হইয়া থাকে। অনির্দিষ্টটা নির্দিষ্টের চেয়ে অনেক মস্ত। আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে। আকার স্বরবর্ণের যোগে ঘুষঘাষ-এর ঘাষ, তুকতাক-এর তাক, ঘুষ অর্থ ও তুক অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল অথচ স্পষ্ট কিছুই বলিল না।

কিন্তু যেখানে মূলশব্দে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে এ নিয়ম খাটে না, পুনর্বার আকার যোগ করিলে কথাটা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিগুণিত করিলে তাহার অর্থ অন্য রকম হইয়া যায়। যদি বলি গোল-গোল, তাহাতে হয় একাধিক গোল পদার্থকে বুঝায় নয় প্রায়-গোল

জিনিসকে বুঝায়। কিন্তু গোল-গাল বলিলে গোল আকৃতি বুঝায়, সেইসঙ্গেই পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরো কিছু অনির্দিষ্ট ভাব মনে আনিয়া দেয়।

এইজন্য এইপ্রকার অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার স্থলে দ্বিগুণিত করা চলে না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন; তাহার দৃষ্টান্ত, দাগদোগ ডাকডোক বাছবোছ সাজসোজ ছাঁটছোঁট চালচোল ধারধোর সাফসোফ।

অন্যরকম : কাটাকোটা খাটাখোটা ডাকাডোকা ঢাকাঢোকা ঘাঁটাঘোঁটা ছাঁটাছোঁটা ঝাড়াঝোড়া চাপাচোপা ঠাসাঠোসা কালোকোলো।

এইগুলির রূপান্তর : কাটাকুটি ডাকাডুকি ঢাকাঢুকি ঘাঁটাঘুঁটি ছাঁটাছুঁটি কাড়াকুড়ি ছাড়াছুড়ি ঝাড়াঝুড়ি ভাজাভুজি তাড়াতুড়ি টানাটুনি চাপাচুপি ঠাসাঠুসি। এইগুলি ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন। বিশেষ্যপদ হইতে উৎপন্ন শব্দ : কাঁটাকুঁটি ঠাট্টাঠুট্টি ধাক্কাধুক্কি।

শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পূর্বে আকার ও পরে ইকার থাকিলে মাঝখানের ওকারটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য উকাররূপ ধরে। শুদ্ধমাত্র 'কোটি' উচ্চারণ সহজ, কিন্তু 'কোটাকোটি' দ্রুত উচ্চারণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। চাপাচোপি ডাকাডোকি ঘাঁটাঘোঁটি, উচ্চারণের চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে, অথচ চুপি ডুকি ঘুঁটি উচ্চারণ কঠিন নহে।

তাহা হইলে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, জোড়া কথাগুলির প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই উ বা ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার-স্বর যুক্ত হয়; যেমন, ঠিকঠাক মিটমাট ফিটফাট ভিড়ভাড় ঢিলেঢালা ঢিপঢাপ ইত্যাদি; কুচোকাচা গুঁড়োগাঁড়া গুঁতোগাঁতা কুটোকাটা ফুটোফাটা ভুজংভাজাং টুকরো-টাকরা হুকুমহোকাম শুকনো-শাকনা; গোলগাল যোগযাগ সোরসার রোখরাখ খোঁচখাঁচ গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।

কিন্তু যেখানে প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে ওকার জুড়িতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে; জোগাড় শব্দের বেলায় হইল জোগাড়-জাগাড়, ডাগর শব্দের বেলায় ডাগরেডোগর। একদিকে দেখো টুকরো-টাকরা হুকুম-হাকাম, অন্য দিকে হাপুস-হুপুস নাদুস-নুদুস। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আকারে ওকারে একটা বোঝাপড়া আছে। ফিরিঙ্গি যেমন ইংরেজের চালে চলে, আমাদের সংকরজাতীয় অ্যাকারও এখানে আকারের নিয়ম রক্ষা করেন; যথা, ঠ্যাকা-ঠোকা গ্যাঁটাগোটা অ্যালাগোলা।

উল্লিখিত নিয়মটি বিশেষ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই খাটে, অর্থাৎ যে-সকল কথায় প্রথমার্ধের অর্থ নির্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ অনির্দিষ্ট; যেমন ঘুষোঘাষা। কিন্তু ঘুষোঘুষি কথাটার ভাব অন্য রকম, তাহার অর্থ দুই পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ঘুষি-চালাচালি; ইহার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছুই নাই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আদ্যক্ষরে সেইজন্য স্বরবিকার হয় নাই।

এইরূপ ঘুষোঘুষি-দলের কথাগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা বুঝাইয়া থাকে; কানাকানি-র মানে, এর কানে ও বলিতেছে, ওর কানে এ বলিতেছে। গলাগলি বলিতে বুঝায়, এর গলা ও, ওর গলা এ ধরিয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের তালিকা এইখানেই দেওয়া যাক—

কষাকষি কচলা-কচলি গড়াগড়ি গলাগলি চটাচটি চটকা-চটকি ছড়াছড়ি জড়াজড়ি টক্করা-টক্করি ডলাডলি ঢলাঢলি দলাদলি ধরাধরি ধস্তাধস্তি বকাবকি বলাবলি।

আঁটাআঁটি আঁচাআঁচি আড়াআড়ি আধাআধি কাছাকাছি কাটাকাটি ঘাঁটাঘাঁটি চাটাচাটি চাপাচাপি চালাচালি চাওয়া-চাওয়ি ছাড়াছাড়ি জানাজানি জাপটা-জাপটি টানাটানি ডাকাডাকি ঢাকাঢাকি তাড়াতাড়ি দাপাদাপি ধাক্কাধাক্কি নাচানাচি নাড়ানাড়ি পালটা-পালটি পাকাপাকি পাড়াপাড়ি পাশাপাশি ফাটাফাটি মাখামাখি মাঝামাঝি মাতামাতি মারামারি বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি বাড়াবাড়ি ভাগাভাগি রাগারাগি রাতারাতি লাগালাগি লাঠালাঠি লাথালাথি লাফালাফি সামনা-সামনি হাঁকাহাঁকি হাঁটাহাঁটি হাতাহাতি হানাহানি হারাহারি (হারাহারি ভাগ করা) খ্যাঁচাখেঁচি খ্যামচা-খেমচি ঘ্যাঁষাঘেঁষি ঠ্যাসাঠেসি ঠ্যালাঠেলি ঠ্যাকাঠেকি ঠ্যাঙাঠেঙি দ্যাখাদেখি ব্যাঁকাবেঁকি হ্যাঁচকা-হেঁচকি ল্যাপালেপি।

কিলোকিলি পিঠোপিঠি (ভাইবোন)।

খুনোখুনি গুঁতোগুঁতি ঘুষোঘুষি চুলোচুলি ছুটোছুটি ঝুলোঝুলি মুখোমুখি সুমুখো-সুমুখি।

টেপাটেপি পেটাপিটি লেখালেখি ছেঁড়াছিঁড়ি।

কোনাকুনি কোলাকুলি কোস্তাকুস্তি খোঁচাখুঁচি খোঁজাখুঁজি খোলাখুলি গোড়াগুড়ি ঘোরাঘুরি ছোঁড়াছুঁড়ি ছোঁওয়াছুঁয়ি ঠোকাঠোকি ঠোকরা-ঠুকরি দোলাদুলি যোকাযুকি রোখারুখি লোফালুফি শোঁকাশুঁকি দৌড়োদৌড়ি।

এই শ্রেণীর জোড়াকথা তৈরির নিয়মে দেখা যাইতেছে—প্রথমার্ধের শেষে আ ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ই যোগ করিতে হয়; যেমন ছড় ধাতুর উত্তরে একবার আ ও একবার ই যোগ করিয়া ছড়াছড়ি, বল্ ধাতুর উত্তরে আ এবং ই যোগ করিয়া বলাবলি ইত্যাদি।

কেবল ক্রিয়াপদের ধাতু নহে, বিশেষ্য শব্দের উত্তরেও এই নিয়ম খাটে; যেমন, রাতারাতি হাতাহাতি মাঝামাঝি ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে, সেখানে আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয়; যেমন কিলোকিলি খুনোখুনি দৌড়োদৌড়ি।

ইহাতে প্রমাণ হয়, ইকার ও উকারের পরে আকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত আছে; যথা, যেখানে লিখিত ভাষায় লিখি—মিলাই মিশাই বিলাই, সেখানে কথিত ভাষায় উচ্চারণ করি—মিলোই মিশোই বিলোই; ডিবা-কে বলি ডিবে, চিনাবাসন-কে বলি চিনেবাসন; ডুবাই লুকাই জুড়াই-কে বলি—ডুবোই লুকোই জুড়োই; কুলা-কে বলি কুলো, ধুলাকে বলি ধুলো ইত্যাদি। অতএব এখানে নিয়মের যে-ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা উচ্চারণবিধিবশত।

যেখানে আদ্যক্ষরে অ্যাকার একার বা ওকার আছে, সেখানে আবার আর-একদিকে স্বরব্যত্যয় ঘটে; নিয়মমত, ঠ্যালাঠ্যালি না হইয়া ঠ্যালাঠেলি, টিপাটেপি না হইয়া টেপাটেপি, এবং কোনাকোনি না হইয়া কোনাকুনি হয়।

কিন্তু, শেষাশেষি দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি মেশামেশি প্রভৃতি শ-ওয়ালা কথায় একারের কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বাংলা উচ্চারণবিধির এই-সকল রহস্য আলোচনার বিষয়।

আমরা শেষোক্ত তালিকাটিকে বাংলার ইঙ্গিত-বাক্যের মধ্যে ভুক্ত করিলাম কেন তাহা বলা আবশ্যক। কানাকানি করিতেছে বা বলাবলি করিতেছে, বলিলে যে-সকল কথা উহ্য থাকে তাহা কেবল কথার ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের কানে কথা বলিতেছে, বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটাকে অর্থবিশিষ্ট কথা ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু কান কথাটাকে দুইবার বাঁকাইয়া বলিয়া একটা ইঙ্গিতে সমস্তটা সংক্ষেপে সারিয়া দেওয়া হইল।

এ পর্যন্ত আমরা তিন রকমের ইঙ্গিত-বাক্য পাইলাম। একটা ধ্বনিমূলক যেমন, সোঁ সোঁ কন্‌কন্ ইত্যাদি। আর-একটা পদবিকারমূলক যেমন, খোলাখালা গোলগাল চুপচাপ ইত্যাদি। আর-একটা পদদ্বৈতমূলক যেমন, বলাবলি দলাদলি ইত্যাদি।

ধ্বনিমূলক শব্দগুলি দুই রকমের; একটা ধ্বনিদ্বৈত, আর একটা ধ্বনিদ্বৈধ। ধ্বনিদ্বৈত যেমন, কলকল কটকট ইত্যাদি; ধ্বনিদ্বৈধ যেমন, ফুটফাট কুপকাপ ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতি প্রকাশ করে।

পদবিকারমূলক শব্দগুলি একটা নির্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারি দিকে অনির্দিষ্ট আভাসটুকুও ফিকা করিয়া লেপিয়া দেয়। পদদ্বৈতমূলক শব্দগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা প্রকাশ করে।

ধ্বনিদ্বৈধ ও পদবিকারমূলক শব্দগুলিতে আমরা এ পর্যন্ত কেবল স্বরবিকারেরই পরিচয় পাইয়াছি; যেমন, হুসহাস—হুসের সহিত যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছে তাহা স্বরবর্ণভেদ; খোলাখালা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এবারে ব্যঞ্জনবর্ণ-বিকারের দৃষ্টান্ত লইয়া পড়িব।

প্রথমে অর্থহীন শব্দমূলক কথাগুলি দেখা যাক; যেমন, উসখুস উস্কোখুস্কো নজগজ নিশপিশ আইঢাই কাঁচুমাচু আবল-তাবল হাঁসফাঁস খুঁটিনাটি আগড়ম-বাগড়ম এবড়ো-খেবড়ো ছটফট তড়বড় হিজিবিজি ফষ্টিনাষ্টি আঁকুবাঁকু হাবজা-গোবজা লটখটে তড়বড়ে ইত্যাদি।

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাতপা চোখমুখ কাপড়চোপড় লইয়া ছোটোখাটো কত কী করাকে যে উসখুস করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয়; কী কী বিশেষ কার্য করাকে যে আইঢাই কর বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন। কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচুমাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কী তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

এ তো গেল অর্থহীন কথা; কিন্তু যে-জোড়াকথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃতি, বাংলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ইনি একেবারে সরকারীভাবে নিযুক্ত; জলটল কথাটথা গিয়েটিয়ে কালোটালো ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও ইঁহার অনধিকার নাই। অভিধানে দেখা যায় ট অক্ষরের কথা বড়ো বেশি নাই, কিন্তু বেকার ব্যক্তিকে যেমন পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বেগার ঠেলিয়া বেড়াইতে হয় তেমনই বাংলাভাষায় কুঁড়েমিচর্চার যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ট-টাকে হাজরে দিতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মূলশব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাংলাভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপসা অর্থ ইশারায় সারিয়া দেয়; জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত। এই সরকারী ট-এর পরিবর্তে এক-এক সময় ফ একটিনি করিতে আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে; যদি বলি লুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।

আর দুটি অক্ষর আছে, স এবং ম। বিশেষভাবে কেবল কয়েকটি শব্দেই ইহাদের প্রয়োগ হয়। স-এর দৃষ্টান্ত : জো-সো জড়োসড়ো মোটাসোটা রকম-সকম ব্যামোস্যামো ব্যারাম-স্যারাম বোকাসোকা নরম-সরম বুড়োসুড়ো আঁটসাট গুটিয়ে-সুটিয়ে বুঝেসুঝে।

ম-এর দৃষ্টান্ত : চটেমটে রেগেমেগে হিঁচকে-মিচকে সিটকে-মিটকে চটকে-মটকে চমকে-মমকে চেঁচিয়ে

মেচিয়ে আঁৎকে-মাৎকে জড়িয়ে-মড়িয়ে আঁচড়ে-মাচড়ে শুকিয়ে-মুকিয়ে কুঁচুকে-মুচকে তেড়েমেড়ে এলোমেলো খিটিমিটি হুড়মুড় ঝাঁকড়া-মাকড়া কটোমটো।

দেখা যাইতেছে ম-এর দৃষ্টান্তগুলি বেশ সাধু শান্ত ভাবের নহে, কিছু রুক্ষ রকমের। বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সচরাচর কথাতেও আমরা ম অক্ষরটাকে ট-এর পরিবর্তে ব্যবহার করি, অন্তত ব্যবহার করিলে কানে লাগে না, কিন্তু সে-সকল জায়গায় ম আপনার মেজাজটুকু প্রকাশ করে। আমরা বিষ-মিষ বলিতে পারি কিন্তু সন্দেশ-মন্দেশ যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে, এ কথা বলা চলে, কিন্তু বন্ধুকে যত্নমত্ন বা গরিবকে দানমান করা উচিত, একেবারে অচল। হিংসে-মিংসে করা যায়, কিন্তু ভক্তিমক্তি করা যায় না; তেমন তেমন স্থলে খোঁচামোচা দেওয়া যায় কিন্তু আদর-মাদর নিষিদ্ধ। অতএব ট-এর ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে, ইহা নিশ্চয়।

তার পরে, কতকগুলি বিশেষ কথার বিশেষ, বিকৃতি প্রচলিত আছে। সেগুলি সেই কথারই সম্পত্তি; যেমন পড়েহড়ে বেছেগুছে মিলেজুলে খেয়েদেয়ে মিশেগুশে সেজেগুজে মেখেচুখে জুটেপুটে লুটেপুটে চুকেবুকে বকেঝকে। এইগুলি বিশেষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।
উল্লিখিত তালিকাটি ক্রিয়াপদের। এখানে বিশেষ্য পদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে : কাপড়-চোপড় আশপাশ বাসন-কোসন রসকস রাবদাব গিন্নিবান্নি তাড়াহুড়ো চোটপাট চাকর-বাকর

হাঁড়িকুঁড়ি ফাঁকিজুকি আঁকজোক এলাগোলা এলোথেলো বেঁটেখেটে খাবার-দাবার ছুঁতোনাতা চাষাভুষো অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু নড়বড় হুলস্থূল।

এ দৃষ্টান্তগুলির গুটিকয়েক কথার একটা উলটাপালটা দেখা যায়; বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে, যেমন : আশপাশ অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু হুলস্থূল।

উল্লিখিত তালিকার প্রথমার্ধের শেষ অক্ষরের সহিত শেষার্ধের শেষ অক্ষরের মিল পাওয়া যায়। কতকগুলি কথা আছে যেখানে সে-মিলটুকুও নাই; যেমন দৌড়ধাপ পুঁজিপাটা কান্নাকাটি তিতিবিরক্ত।

এইবার আমরা ক্রমে ক্রমে একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতেছি যেখানে জোড়াশব্দের দুইটি অংশই অর্থবিশিষ্ট। সে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোঠায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বোঝানো যাক। ছাইভস্ম কালিকিষ্টি লজ্জাশরম প্রভৃতি জোড়াকথার দুই অংশের একই অর্থ; এ কেবল জোর দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল :

চিঠিপত্র লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য দুঃখধান্দা ছাইপাঁশ ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু কাজকর্ম ক্রিয়াকর্ম ছোটোখাটো ছেলেপুলে ছেলে-ছোকরা খড়কুটো সাদাসিধে জাঁক-জমক বসবাস সাফ-সুৎরো ত্যাড়াবাঁকা পাহাড়-পর্বত মাপজোখ সাজসজ্জা লজ্জাশরম ভয়ডর পাকচক্র ঠাট্টা-তামাশা ইশারা-ইঙ্গিত পাখি-পাখালি জন্তু-জানোয়ার মামলা-মকদ্দমা গা-গতর খবর-বার্তা অসুখ-বিসুখ গোনা-গুনতি ভরা-ভরতি কাঙাল-গরিব গরিবদুঃখী গরিবগুরবো রাজা-রাজড়া খাটপালং বাজনা-বাদ্য কালিকিষ্টি দয়ামায়া মায়া-মমতা ঠাকুর-দেবতা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চালাক-চতুর শক্ত-সমর্থ গালি-গালাজ ভাবনা-চিন্তে ধর-পাকড় টানা-হ্যাঁচড়া বাঁধাছাঁদা নাচাকোঁদা বলা-কওয়া করাকর্ম।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনো অর্থসামঞ্জস্য পাওয়া যায় না; যেমন: মেগেপেতে কেঁদেকেটে বেয়েছেয়ে জুড়েতেড়ে পুড়েঝুড়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আগেভাগে গালমন্দ পাকে-প্রকারে।

বাংলাভাষায় পত্র শব্দযোগে যে-কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সেগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে; কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনো অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ঐরূপ, তৈজসপত্র জিনিসপত্র খরচপত্র বিছানাপত্র ঔষধপত্র হিসাবপত্র দেনাপত্র আসবাবপত্র পুঁথিপত্র বিষয়পত্র চোতাপত্র দলিলপত্র এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

যে-সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অর্থটা কাছাকাছি, তাহাদের দৃষ্টান্ত : মাল-মসলা দোকান-হাট হাঁকডাক ধীরেসুস্থে ভাব-গতিক ভাবভঙ্গি লম্ফঝম্ফ চাল-চলন পাল-পার্বণ কাণ্ড-কারখানা কালিঝুলি ঝড়ঝাপট বনজঙ্গল খানাখন্দ জোতজমা লোক-লশকর চুরি-চামারি উঁকিঝুঁকি পাঁজিপুঁথি লম্বা-চওড়া দলামলা বাছ-বিছার জ্বালা-যন্ত্রণা সাতপাঁচ নয়ছয় ছকড়া-নকড়া উনিশ-বিশ সাত-সতেরো আলাপ-পরিচয় কথাবার্তা বন-বাদাড় ঝোপঝাড় হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদ লোহা-লক্কড় শাক-সবজি বৃষ্টি-বাদল ঝড়তুফান লাথিঝাঁটা সেঁকতাপ আদর-অভ্যর্থনা চালচুলো চাষবাস মুটে-মজুর ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়াশব্দ জোর দিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়—মালমসলা দোকানহাট প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্নার্থক জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে। কাণ্ড-কারখানা চুরিচোমারি হাসিখুসি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও আছে আভাসও আছে।

যে-সকল পদার্থ আমরা সচরাচর একসঙ্গে দেখি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদিভাবে বুঝাইয়া দিবার প্রথাও বাংলায় প্রচলিত আছে; যেমন ঘটিবাটি। যদি বলা যায় ঘটিবাটি সামলাইয়ো, তাহার অর্থ এমন নহে যে, কেবল ঘটি ও বাটিই সমালাইতে হইবে, এইসঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিস আসিয়া পড়ে। কাহারো সহিত মাঠে-ঘাটে দেখা হইয়া থাকে, বলিলে কেবল যে ঐ দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বুঝায় না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জোড়াকথার দৃষ্টান্ত : পথঘাট ঘর-দুয়োর ঘটিবাটি কাছা-কোঁচা হাতিঘোড়া বাঘ-ভাল্লুক খেলাধুলা (খেলা-দেয়ালা) পড়াশুনা খালবিল লোক-লশকর গাড়ু-গামছা লেপকাঁথা গান-বাজনা খেতখোলা কানাখোঁড়া কালিয়া-পোলাও শাকভাত সেপাই-সান্ত্রী নাড়ি-নক্ষত্র কোলেপিঠে

কাঠখড়	দত্যিদানো	ভূতপ্রেত।

বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার দৃষ্টান্ত : আগাগোড়া ল্যাজামুড়ো আকাশ-পাতাল দেওয়া-থোওয়া নরম-গরম আনাগোনা উলটোপালটা তোলপাড় আগা-পাস্তাড়া। এই যতপ্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা। বাঘভাল্লুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে; বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা নারাজ হয়, অথচ অর্থের অসংগতি হয় না।

এইখানে ইংরেজিতে যে-সকল ইঙ্গিতবাক্য প্রচলিত আছে তাহার যে-কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি; বাংলার সহিত তুলনা করিলে পাঠকেরা সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন : nick-nack riff-raff wishy-washy dilly-dally shilly-shally pit-apat bric-a-brac।

এই উদাহরণগুলিতে জোড়াশব্দের দ্বিতীয়ার্ধে আকারের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বাংলাতেও এইরূপ স্থলে শেষার্ধে আকারটাই আসিয়া পড়ে; যেমন, হো-হা জো-জা জোর-জার। কিন্তু যেখানে প্রথমার্ধে আকার থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি; যেমন, ঘা-ঘো টান-টোন টায়েটোয় ঠারে-ঠোরে। সবশেষে যদি ইকার থাকে তবে মাঝের ওকার উ হইয়া যায়, যেমন জারি-জুরি।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঞ্জনবর্ণবিকারের দৃষ্টান্ত : Hotchpotch higgledy-piggledy harum-scarum helter-skelter holity-toity hurly-burly roly-poly hugger-mugger namby-pamby wish-washy।

আমাদের যেমন টুং টাং ইংরেজিতে তেমনই ding-dong, আমাদের যেমন ঠঙাঠঙ ইংরেজিতে তেমনই

ding a dong।

প্রথমার্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্ধের মিল নাই এমন দৃষ্টান্ত-topsyturvy।

জোড়াশব্দের দুই অংশে মিল নাই, এমন কথা সকল ভাষাতেই দুর্লভ। মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে; একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর-একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝংকৃত হইয়া উঠে, জোড়া মিলের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে, সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না, ছন্দের পর্বে পর্বে বারংবার আঘাতে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে; কেবলমাত্র কথাদ্বারা মন যতটুকু বুঝিত, মিলের ঝংকারে অনির্দিষ্টভাবে তাহাকে আরো অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হল তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।

এইখানে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই প্রবন্ধের বিষয়টি অনেকের কাছে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিবে। আমার কৈফিয়ত এই যে, বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবেজ্ঞয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ। আমার মতো সাহিত্যওয়ালা বিপদে পড়িয়া বিজ্ঞানের দোহাই মানিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু প্রেমের নিবেদন যদি জানাই, বলি মাতৃভাষার কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ নহে—তবে আশা করি কেহ নাসা কুঞ্চিত করিবেন না। মাতাকে সংস্কৃতভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা-কিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারো মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলাভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে এবং এই আকৃতিপ্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের

সহিত বাংলাভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।

একটি প্রশ্ন

ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় কতকগুলি জায়গায় ভাবনা উপস্থিত হয়। যথা- ইংরেজি sir। বাংলায় সার লেখা উচিত না সর্‌ লেখা উচিত? ইংরেজি ৎ অক্ষরে বাংলার ব না ভ? vow শব্দ বাংলায় কি বৌ লিখিব, না ভৌ লিখিব, না বাউ অথবা ভাউ লিখিব। এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত যাহা বলেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তাই এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম।

সাধারণত পণ্ডিতেরা বলেন perfect শব্দের e, sir শব্দের i আ নহে- উহা অ। stir শব্দের i এবং star শব্দের a কখনো এক হইতে পারে না-শেষোক্ত a আমাদের আ এবং প্রথমোক্ত i আমাদের অ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শুনিবামাত্র অনুভব করা যায় যে, stir শব্দের i এবং star শব্দের a একই স্বর; কেবল উহাদের মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভেদ মাত্র। সংস্কৃতবর্ণমালায় অ এবং আ-এ হ্রস্বদীর্ঘের প্রভেদ, কিন্তু বাংলাবর্ণমালায় তাহা নহে। বাংলা অ আকারের হ্রস্ব নহে, তাহা একটি স্বতন্ত্র স্বর, অতএব সংস্কৃত অ যেখানে খাটে বাংলা অ সেখানে খাটে না। হিন্দুস্থানিরা কলম শব্দ কিরূপে উচ্চারণ করে এবং আমরা কিরূপ করি তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিলেই উভয় অকারের প্রভেদ বুঝা যায়। হিন্দুস্থানিরা যাহা বলে তাহা বাংলা অক্ষরে ‘কালাম’ বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, আ স্বর আমরা প্রায় হ্রস্বই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাংলায় কল লিখিলে ইংরেজি call কথাই মনে আসে, কখনো cull মনে হয় না; শেষোক্ত কথা বাংলায় কাল লিখিলেই প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি যায়। এইরূপ noun শব্দবর্তী ইংরেজি ou আমাদের ঔ নহে, তাহা আউ; অথবা time শব্দবর্তী i আমাদের ঐ নহে তাহা আই। v শব্দের উচ্চারণ অনেকে বলিয়া থাকেন অন্ত্যস্থ ব। আমার তাহা ঠিক মনে হয় না। ইংরেজি w প্রকৃত অন্ত্যস্থ ব, ইংরেজি f অন্ত্যস্থ ফ, ইংরেজি v অন্ত্যস্থ ভ। কিন্তু অন্ত্যস্থ ফ অথবা অন্ত্যস্থ ভ আমাদের নাই। এইজন্য বাধ্য হইয়া f ও v-র জায়গায় আমাদিগকে ফ ও ভ ব্যবহার করিতে হয়; wise এবং voice শব্দ উচ্চারণ করিলে w এবং v-এর প্রভেদ বুঝা যায়। w-এর স্থানে ব দিলে বরঞ্চ সংস্কৃত বর্ণমালার হিসাবে ঠিক হয়, কিন্তু v-র স্থানে ব দিলে কোন্‌ হিসাবে ঠিক হয় বুঝিতে পারি না। আমার মতে আমাদের

বর্ণমালার ভ-ই **v**-এর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি আসে। যাহা হউক এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করি।

সংজ্ঞাবিচার

পৌষ মাসের বালকে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বাহির করিবার জন্য ‘হুজুগ’, ‘ন্যাকামি’, এবং ‘আহ্লাদে’ এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, পাঠকদের নিকট হইতে অনেকগুলি সংজ্ঞা আমাদের হাতে আসিয়াছে। ১

কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রচলিত। আমরা পরস্পর কথোপকথনে ঐ কথাগুলি যখন ব্যবহার করি তখন কাহারো বুঝিবার ভুল হয় না, অথচ স্পষ্ট করিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে এমন বুঝাইতেছে না যে, বাস্তবিকই ঐ কথাগুলি ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া থাকেন—কারণ, তাহা হইলে তো ও কথা লইয়া কোনো কাজই চলিত না। প্রকৃত কথা এই, আমরা অনেক জিনিস বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কী বুঝিলাম সেটা ভালো করিয়া বুঝিতে অনেক চিন্তা আবশ্যক করে। যেমন আমরা অনেকে সহজেই সাঁতার দিতে পারি, কিন্তু কী উপায়ে সাঁতার দিতেছি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। অথবা, একজন মানুষ রাগিলে তাহার মুখভঙ্গি দেখিলে আমরা সহজেই বলিতে পারি মানুষটা রাগিয়াছে; কিন্তু আমি যদি পাঁচজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলো দেখি রাগিলে মানুষের মুখের কিরূপ পরিবর্‌তন হয়, মুখের কোন্ কোন্ মাংসপেশীর কিরূপ বিকার হয়, মুখের কোন্ অংশের কিরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে পাঁচজনের বর্ণনায় প্রভেদ লক্ষিত হইবে। অথচ ক্রুদ্ধ মনুষ্যকে দেখিলেই পাঁচজনে বিনা মতভেদে সমস্বরে বলিয়া উঠিবে লোকটা ভারি চটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকদের নিকট হইতে যে-সকল সংজ্ঞা পাইয়াছি তাহার কতকগুলি এই স্থানে পরে পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাইবে।

একজন বলিতেছেন, ‘হুজুক—জনসাধারণের হৃদয়োন্মাদক আন্দোলন।’ তা যদি হয় তো, বুদ্ধ চৈতন্য যিশু ক্রমোয়েল ওয়াশিংটন প্রভৃতি সকলেই হুজুক করিয়াছিলেন। কিন্তু লেখক কখনোই সচরাচর কথোপকথনে এরূপ অর্থে হুজুক ব্যবহার করেন না।

ইনিই বলিতেছেন, ‘ন্যাকামি—অভিমানবশত কিছুতে অনিচ্ছা প্রকাশ অথবা ইচ্ছাসত্ত্বে অভিমানীর অনিচ্ছা প্রকাশ।’

স্থলবিশেষে অভিমানচ্ছলে কোনো ব্যক্তি ন্যাকামি করিতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অভিমানবশত অনিচ্ছা প্রকাশ করাকেই যে ন্যাকামি বলে তাহা নহে।

আহ্লাদে শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি বলেন, ‘দশজনের আহ্লাদ পাইয়া অহংকৃত।’ প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অহংকৃত এবং ‘আহ্লাদে’-র মধ্যে যে অনেক প্রভেদ বলাই বাহুল্য।

হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিত প্রাপ্ত সংজ্ঞাগুলি পরে পরে প্রকাশ করিলাম।

হুজুগ

১। বিস্ময়জনক সংবাদ যাহাসত্য কি মিথ্যা নির্নয় করা কঠিন।

২। অকারণ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহ (অকারণ শব্দের দুই অর্থ- ১ অনির্দিষ্ট; ২ তুচ্ছ, সামান্য)।

৩। অল্পেতে নেচে ওঠার নাম।

৪। অতিরজ্ঞিত জনরব।

*

৬। ফল অনিশ্চিত এরূপ বিষয়ে মাতা।

৭। কোনো এক ঘটনা; লোকে যাহার হ্যাপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসে। ‘বাজারদরে নেচে বেড়ানো।’ ‘ঝড়ের আগে ধুলা উড়া।’

৮। ফস্ কথায় নেচে ওঠা।

৯। দেশব্যাপী কোনো নূতন (সত্য এবং মিথ্যা) আন্দোলন।

১০। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা।

প্রথম সংজ্ঞাটি যে ঠিক হয় নাই তাহা ব্যক্ত করিয়া বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই যে লেখক নিজেই অকারণ শব্দের যে-অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যাহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই এমন কোনো তুচ্ছ সামান্য বিষয়কেই বোধ করি তিনি অকারণ বিষয় বলিতেছেন-তাঁহার মতে এইরূপ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহকেই হুজুগ বলে। কেহ যদি বিশেষ উদ্যোগের সহিত একটা বালুকার স্তূপ নির্মাণ করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া পরমোৎসাহে তাহা আবার ভাঙিতে থাকে তবে তাহাকে হুজুগে বলিবে না পাগল বলিবে?

তৃতীয় সংজ্ঞা। রাম যদি ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র উৎসাহে নাচিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুগে বলিবে।

চতুর্থ সংজ্ঞা। অতিরঞ্জিত জনরবকে যে হুজুগ বলে না তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শ্যাম তাহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাঁচশো টাকা খরচ করিয়াছে; লোকে যদি

রটায় যে সে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে, তবে সেই জনরবকেই কি হুজুগ বলিবে।

পঞ্চম সংজ্ঞা। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অসম্ভব সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া থাকে, তাহাকে কেহ হুজুগ বলে না।

ষষ্ঠ সংজ্ঞা। লাভ অনিশ্চিত এমনতরো ব্যবসায়ে অনেকে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেরূপ ব্যবসায়কে কেহ হুজুগ বলে না।

সপ্তম। এ সংজ্ঞাটি পরিষ্কার নহে। যে-ঘটনায় স্রোতে লোকে ভাসিতে থাকে তাহাকে হুজুগ বলা যায় না; তবে লেখক হ্যাপা শব্দের যোগ করিয়া ইহার মধ্যে আর-একটি নূতন ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু হ্যাপা শব্দের ঠিক অর্থটি কী সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে, অতএব হুজুগ শব্দের ন্যায় হ্যাপা শব্দও সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। সুতরাং হ্যাপা শব্দের সাহায্যে হুজুগ শব্দ বোঝাইবার চেষ্টা সংগত হয় না। ‘বাজার দরে নেচে বেড়ানো’, ‘ঝড়ের আগে ধুলা উড়া’—দুটি ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট নহে।

অষ্টম। হরি যদি মাধবকে বলে, তুই ট্যাঁকশালের দাওয়ান হইবি—অমনি যদি মাধব নাচিয়া উঠে—তবে মাধবের সেই উৎসাহ-উল্লাসকে হুজুগ বলা যায় না।

নবম। আন্দোলন নূতন হইলেই তাহাকে হুজুগ বলা যাইতে পারে না।

দশম। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা মাত্রই হুজুগ বলিতে পারি না। কোনো রায়বাহাদুর যদি তাহার খেতাব ও গাড়িজুড়ি লইয়া মাতিয়া থাকে, তাহার সেই মত্ততাকে কি হুজুগ বলা যায়।

আমরা যে-লেখককে পুরস্কার দিয়াছি তিনি হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিতমত ব্যাখ্যা করেন :

‘মাথা নাই মাথা ব্যথা গোছের কতকগুলো নাচুনে জিনিস লইয়া যে নাচন আরম্ভ হয় সেই নাচনের অবস্থাকেই হুজুগ বলে। বিশেষ কিছুই হয় নাই অথবা অতি সামান্য একটা-কিছু হইয়াছে আর সেইটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার নাম হুজুগ।’

আমরা দেখিতেছি হুজুগে প্রথমত এমন একটা বিষয় থাকা চাই যাহার প্রতিষ্ঠাভূমি নাই—যাহার ডালপালা খুব বিস্তৃত, কিন্তু শিকড়ের দিকের অভাব। মনে করো আমি ‘সার্বজনীনতা’ বা ‘বিশ্বপ্রেম’ প্রচারের জন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি; তাহার কত মন্ত্রতন্ত্র কত অনুষ্ঠান তাহার ঠিক নাই, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকদের প্রতি আমাদের জাত-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে—মূলেই প্রেমের অভাব অথচ প্রেমের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই।

দ্বিতীয়ত, ইহার সঙ্গে একটা নাচনের যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ কাজের প্রতি ততটা নহে যতটা মত্ততার প্রতি লক্ষ। অর্থাৎ হো-হো করিয়া বেশ সময় কাটিয়া যাইতেছে, খুব একটা হাঙ্গামা হইতেছে এবং তাহাতেই একটা আনন্দ পাইতেছি। যদি স্থির হইয়া স্তব্ধভাবে কাজ করিতে বল তবে তাহাতে মন লাগে না, কারণ নাচানো এবং নাচা, এ-দুটোই মুখ্য আবশ্যক। তৃতীয়ত, কেবল একজনকে লইয়া হুজুগ হয় না—সাধারণকে আবশ্যক—সাধারণকে লইয়া একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা। চতুর্থত, হুজুগ কেবল একটা খবরমাত্র রটানো নহে; কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমারোহের সহিত উদ্যোগ করা, তার পরে সেটা হউক বা না-হউক।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখকের সংজ্ঞা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার সংজ্ঞার দুইটি পদকে সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই একপদে পরিণত করিতে পারিতেন।

সংজ্ঞা রচনা করা যে দুরূহ তাহার প্রধান একটা কারণ এই দেখিতেছি যে, একটি কথার সহিত অনেকগুলি জটিল ভাব জড়িত হইয়া থাকে, লেখকেরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে তাহার সকলগুলি গুছাইয়া লইতে পারেন না—অনবধানতাদোষে একটা-না-একটা বাদ পড়িয়া যায়। উদ্‌ধৃত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পাঠকেরা তাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন।

ন্যাকামি

১। জানিয়া না-জানার ভান।

২। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করা।

৩। জেনেও জানি না, এই ভাব প্রকাশ করা।

৪। জানিয়াও না-জানার ভান।

৫। অবগত থাকিয়া অজ্ঞতা দেখানো।

৬। বিলক্ষন জানিয়াও অজ্ঞানতার লক্ষন প্রকাশ করা।

৭। বুঝেও নিজেকে অবুঝের ন্যায় প্রতিপন্ন করা।

৮। সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা।

৯। জেনেশুনে ছেলেম।

১০। বুঝে অবুঝ হওয়া। জেনেশুনে হাবা হওয়া।
১১। ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা এবং মিথ্যা সরলতা।

প্রথম হইতে সপ্তম সংজ্ঞা পর্যন্ত সকলগুলির ভাব প্রায় একই রকম। অর্থাৎ সকলগুলিতেই জানিয়াও না-জানার ভান, এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু এরূপ ভাবকে অসরলতা মিথ্যাচরণ বা কপটতা বলা যায়। কিন্তু কপটতা ও ন্যাকামি ঠিক একরূপ জিনিস নহে। অষ্টম সংজ্ঞায় লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় যে বলিয়াছেন, সেয়ানা হইয়া বোকা সাজা, ইহাই আমার ঠিক বোধ হয়। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করিলেই হইবে না, সেইসঙ্গে প্রকাশ করিতে হইবে আমি যেন নির্বোধ, আমার যেন বুঝিবার শক্তিই নাই। ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংজ্ঞাতেও কতকটা এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নবম ও দশম সংজ্ঞা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম হইতে দশম সংজ্ঞাতে বোকা, ছেলেমি, হাবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই শব্দগুলি সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। অর্থাৎ হাবামি, বোকামি ও ছেলেমির বিশেষ লক্ষণ কী তাহা মনোযোগ-সহকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এইজন্য একাদশ সংজ্ঞার লেখক যে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ভানের সঙ্গে 'মিথ্যা সরলতা' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ন্যাকামি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে। অজ্ঞতা এবং সরলতা উভয়ের ভান থাকিলে তবে ন্যাকামি হইতে পারে। আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক লিখিয়াছেন, "ন্যাকামি বলিতে সাধারণত জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজার ভাব বুঝায়" পরে দ্বিতীয় পদে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না এই ভাবের নাম ন্যাকামি।" যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না বলিতে লোকটা যেন নেহাত হাবা, নিতান্ত খোকা এইরূপ বুঝায়, লোকটা যেন কিছু বুঝেই না, এবং তাহাকে বুঝাইবার উপায়ও নাই।

আহ্লাদে

১। স্বার্থের জন্য বিবেচনারহিত।
২। যাহার পরিমানাধিক আহ্লাদে সর্বদাই মত্ত।
৩। যে সকল-তা’তেই অন্যায়রূপে আমোদ চায়, অথবা যে হক্‌ না হক্‌ দাঁত বের করে।
৪। অযথা আনন্দ বা আভিমান প্রকাশক।
৫। অন্যকে অসন্তুষ্ট করিয়া যে নিজে হাসে।
৬। যে সর্বদা আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।
৭। কী সময়ে কী আসময়ে যে আহ্লাদ প্রকাশ করে।
৮। যে অভিমানী অল্পে অধৈর্য হয়।
৯। যে অনুপযুক্ত সময়েও আবদারী।
১০। সাধের গোপাল নীলমণি।

আমার বোধ হয়, যে-ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে; প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের কাছে আদুরে ছেলেরা যেরূপ ব্যবহার করে যে-ব্যক্তি সকল জায়গাতেই কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতে যায়। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সময়-অসময় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবদার করিতে যায়, সর্বত্রই দাঁত বাহির করে, মনে করে সকলেই তাহার সকল বাড়াবাড়ি মাপ করিবে, সে-ই আহ্লাদে। তাহাকে কে চায় না-চায়, তাহাকে কে কী ভাবে দেখে, সে-বিষয় বিবেচনা না করিয়া সে দুলিতে দুলিতে গায়ে পড়িয়া সকলের গা ঘেঁষিয়া বসে, সকলের আদর কাড়িতে চেষ্টা করে। সংজ্ঞালেখকগণ অনেকেই আহ্লাদে ব্যক্তির এক-একটি লক্ষণমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বলিলে তাহার সকল লক্ষণ ব্যক্ত হয় এমন কোনো কথা বলেন নাই। দশম সংজ্ঞাকে ঠিক সংজ্ঞা বলাই যায় না।

যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে তাঁহার আহ্লাদে শব্দের সংজ্ঞা ঠিক হয় নাই। তিনি বলেন :

ভাতের ফেনের মতো টগবগে। যাহাদিগের প্রায় সকল কার্যেই ‘একের মরণ অন্যের আমোদ’ কথার সত্যতা প্রমাণ হয়, অর্থাৎ তুমি বাঁচ আর মর আমার আমোদ হইলেই হইল, ইহাই যাহাদিগের মত ও কার্য, তাহাদিগকে ‘আহ্লাদে’ বলা যায়।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক দুটি সংজ্ঞার উত্তর দিয়াছেন। তৃতীয়টিতে কৃতকার্য হন নাই। শ্রী বঃ—বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন, বোধ করি নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। আমরা বলিয়াছিলাম সংজ্ঞা পাঁচ পদের অধিক না হয়, কেহ কেহ পদ বলিতে শব্দ বুঝিয়াছেন। আমরা ইংরেজি sentence অর্থে পদ ব্যবহার করিয়াছি।

‘নিছনি’

১

তৃতীয়সংখ্যক ‘সাধনা’য় কোনো পাঠক নিছনি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তাহার উত্তরে জগদানন্দবাবু নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনিচ্ছা অর্থে নিছনির ব্যবহার কোথাও দেখা যায় নাই : গোবিন্দদাসে আছে :

গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।

স্পষ্টই অনুমান করা যায়, ‘বালাই লইয়া মরি’ বলিতে যে ভাব বুঝায় ‘নিছনি লইয়া মরি’ বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু সর্বত্র নিছনি শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের কোনো পদে আছে :

পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।

এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।

বসন্ত রায়ের অন্যত্র আছে :

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মুলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।

এখানে নিছনি বলিতে কী বুঝাইতেছে ঠিক করিয়া বলা শক্ত। এরূপ স্থলে নিছনি শব্দের সংস্কৃত মূলটি বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।

গোবিন্দদাসের এক স্থলে আছে :

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

এ স্থলে ‘নিছিয়া’ এবং ‘নিরছাই’ এক ধাতুমূলক বলিয়া সহজেই বোধ হয়।

অন্যত্র আছে :

বন্ধু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব
তব হুঁ না সৌঁপব অঙ্গ।

ইহার অর্থ, বরং আমার জীবন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিব তথাপি অঙ্গ সমর্পণ করিব না।

আর-এক স্থলে দেখা যায় :

কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান।

অর্থাৎ তোমার চরণে মাথা লুটাইয়া কানের কুণ্ডল ও চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ দিয়া তোমার পা মুছাইয়া দিয়াছে, তথাপি তোমার মান গেল না?

এই নির্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ দেখা যায়—'নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা।' নীরাজনা অর্থ "আরাত্রিক, দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, বিলবপত্রাদি, সাষ্টাঙ্গপ্রণাম—এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরুতি।" উহার আর-এক অর্থ 'শান্তিকর্ম বিশেষ।'

অতএব যেখানে 'নিছনি লইয়া মরি' বলা হয়, সেখানে বুঝায় তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া মরি—এখানে 'শান্তিকর্ম' অর্থের প্রয়োগ।

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই

এ স্থলে নিরছাই অর্থে মোছা।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুইয়া চরণ।

এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্ঘ্যোপহার বুঝাইতেছে।

পরাণ নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার

অর্থাৎ, তোমার প্রেমে প্রাণকে উপহার স্বরূপে অর্পণ করি।

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী
মুলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি।

ইহার অর্থ বোধ করি নিম্নলিখিত মতো হইবে-

তোমার প্রেমে যখন আমি সমুলে বিক্রীত হইয়াছি তখন বিশেষ করিয়া আরাধনাযোগ্য উপহার আর কী দিব।

বর্তমানপ্রচলিত ভাষায় এই নিছনি শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি; যদি কোনো পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান তো বাধিত হই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।

২

মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ যৌবন সকল করি মানি
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার নিছনি।

এ স্থলে নিছনি অর্থে পুজা। আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি 'নির্মঞ্ছন' শব্দের একটি অর্থ আরাধনা।

সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু।

নিছনি অর্থে যখন মোছা হয় তখন 'আপনে নিছিনু' অর্থে আপনাকে মুছিলাম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিলাম অর্থ অসংগত হয় না।

পদ পঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুনুঝুনু খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।

আমার মতে এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজার উপহার। অর্থাৎ গোবিন্দদাস চরণপঙ্কজে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে সমর্পণ করিতেছেন।

যশোদা আকুল হইয়া ব্যাকুলি রাইএরে করল কোলে
ও মোর বাছনি জান মু নিছনি ভোজন করহ বলে।

'জান মু নিছনি' অর্থাৎ আমি তোমার নিছনি যাই। অর্থাৎ তোমার অশান্তি অমঙ্গল আমি মুছিয়া লই; যেরূপ ভাবে 'বালাই লইয়া মরি' ব্যবহার হয়, 'নিছনি যাই' বলিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছে।

নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি
কার ঘরের শিশু তোমার যাইতে নিছনি।

আমার বিবেচনায় এখানেও নিছনি অর্থে বালাই বুঝাইতেছে।

সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি
বাপ মোর যাইরে নিছনি।

এখানেও তাহাই।

নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন
কহয়ে মাধব উঠি বসিল তখন।

নিছনি যাইয়ে —অর্থাৎ সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া।

১। অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।

অমিয়া নিছনি—অর্থাৎ অমৃত মুছিয়া লইয়া।

২। নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
মো পুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম ফলে।

নিছিয়া লইনু—আরাধনা করিয়া লইনু, অর্থাৎ বরণ করিয়া লইনু অর্থ হইতে পারে।

৩। তথা কনক বরণ কিরে দরপণ নিছনি দিয়ে যে তার
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।

৪। তনু ধন জন যৌবন নিছিনু কালার পিরিতে।

উদ্ধৃত [১, ২, ৩, ৪] অংশগুলি চণ্ডীদাসের পদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

নিছনি শব্দ যদি নির্মঞ্ছন শব্দেরই অপভাষা হয় তবে নির্মঞ্ছন শব্দের যতগুলি অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। দীনেন্দ্রকুমার বাবু নিছনি শব্দের যতগুলি প্রয়োগ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহার সকলগুলিতেই কোনো-না-কোনো অর্থে নির্মঞ্ছন শব্দ খাটে।

দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে-সকল দুর্বোধ শব্দপ্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়োই সুখের বিষয় হইবে।

‘পহুঁ’

বৈষ্ণব কবিদের গ্রনেথ সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন পহু অর্থে প্রভু এবং পঁহু অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে, নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু এবং পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু।

গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর

অর্থাৎ গোবিন্দদাসের প্রভু নটবর শেখর।

রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ

অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ।

নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান,
রসিক কলাগুরু তুহ সব জান।

ইহার অর্থ এই, তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান, তুমি রসিক কলাগুরু, তুমি সকলই জান। এরূপ ভণিতা হিন্দি গানেও দেখা যায়। যথা :

তানসেনপ্রভু আকবর।

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙাও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাসের পহু
হাসিয়া হাসিয়া রহু।

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না।

রাধামোহন পহু দুঁহু অতি নিরুপম।

এ স্থলে পহুঁ-র ভণে অর্থ না হইলে আর-কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আরেকোনো বৈষ্ণব কবিতায় পহুঁ শব্দের এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে পহুঁ-র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল-দৈবাৎ দুই-একটি যদি পাওয়া যায়।

রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে।

এ স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে পহুঁ-র ‘ভণে’ অর্থব্যবহার দেখা যায়।

গোবিন্দদাস পহুঁ দীপ সায়াহ্ন, বেলি অবসান ভৈ গেলি।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে, সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এ স্থলে আরেকোনোরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরো এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে পহুঁ-র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে। এক, ভণহুঁ ১ হইতে ভুহুঁ এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে—কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমানমাত্র। বিশেষত, যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোনো প্রাচীন পদকর্তার পদে পহুঁ-র এরূপ অর্থ দেখা যায় না তখন উক্ত অনুমানের সংগত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ ভণিতা পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। ‘গোবিন্দদাস পঁহু’, অর্থাৎ ‘গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন’, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাস পহুঁ এই রস গায়।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্‌চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদের পদে একপ্রকার অনির্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা :

তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।
রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।
গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে জানিয়ে কী ভেল গোরি।

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখনো বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখনো বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনোরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সংগত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, আমার কোনো শ্রদ্ধেয় পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে, তাঁহাদের দেশে ‘নিছেপুঁছে’ শব্দের চলন আছে। এবং নববধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে

গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে ‘নিছিয়া’ লওয়া হয়। অতএব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে নিছনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

প্রত্যুত্তর

পঁহু প্রসঙ্গ

১

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

মান্যবরেষু

আপনি বলিয়াছেন :

অপভ্রংশের নিয়ম সকলজাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এইজন্যই বাংলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে :

শব্দশাস্ত্রের কোনো সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।

কিন্তু যে-হেতুক বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনো রচিত হয় নাই, ইহার সূত্র নির্ধারণ করার কোনো উপায় নাই। অতএব বাংলার আরো দুই-চারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি আপনার তর্কটা এই যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোনো সংস্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। 'বন্ধু' হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই; যথা, কক্ষ হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শস্য হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণত অপ্রচলিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুইএকটি শব্দ উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে; যথা, শৈবাল হইতে শেঁয়লি; শ্রাবণ হইতে সাঙন।

ত বর্গের চতুর্থ বর্ণ ধ যেমন হ-এ পরিবর্তিত হইতে পারে তেমনই প বর্গের চতুর্থ বর্ণ ভ-ও অপভ্রংশে হ হইতে পারে, এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোনো মতান্তর নাই। তথাপি দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া কর্তব্য; যথা, শোভন হইতে শোহন, গাভী হইতে গাই (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই), নাভি হইতে নাই (হি হইতে ই হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে, যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে-সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোনো ভ্রম না থাকে তবে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহু-র উদ্ভব হইতে আটক নাই, আপনি তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত পঁহু শব্দ বিদ্যাপতির কোনো মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি। আমি তো গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলাপ্রচলিত পুঁথিতে কোথাও ‘পহু’ ছাড়া ‘পঁহু’ দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বহ্নু, বহ্নু হইতে পহ্নু এবং পহ্নু হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙালির মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে, ইহাই আমার নিকট অধিকতর সংগত বোধ হয়। বিশেষত বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

আর-একটা কথা এই যে, বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর।
রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ।
নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান। ইত্যাদি।

এ স্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধু শব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দু-ই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সংগত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত স্থানে দেখিয়াছি যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই; যদি আপনার সন্দেহ থাকে তো ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়ত, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্ব অনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষত, পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ হ-এ এবং ন চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্যয় নিয়মবিরুদ্ধ হয় নাই। নিবেদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২

পঁহু শব্দ বন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা আপনি স্বীকার করেন, তথাপি উক্ত শব্দ যে প্রভুশব্দমূলক তাহা আপনার সংগত বোধ হয় না। কিন্তু পঁহু যে তৎসম বা তদ্‌ভব সংস্কৃত শব্দ নহে পরন্তু দেশজ শব্দ, আপনার এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনো উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল আপনি বলিয়াছেন, "মধুররসসর্বস্ব পরকীয়া প্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত।" কিন্তু এই একমাত্র যুক্তি আমার নিকট যথেষ্ট প্রবল বোধ হয় না; কারণ, বৈষ্ণবপদাবলীতে অনেক স্থানেই রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী ও কৃষ্ণ আপনাকে রাধিকার দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পদাবলীতে স্থানে স্থানে পঁহু শব্দ প্রভু অথবা বঁধু ছাড়াও অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

রাধামোহন দাস রাধিকার বিরহবর্ণনা করিতেছেন :

প্রেমগজদলন সহই না পারই জীবইতে করই ধিকার।
অন্তরগত তুহু নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।
অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জ্বর ছটফট জলজ শয়ান।
রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবান।

অর্থাৎ শ্যামকে সম্বোধন করিয়া দূতী কহিতেছে :

প্রেমগজের দলন সহিতে না পারিয়া রাধিকা বাঁচিয়া থাকা ধিক্কারযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তর্গত তোমাকে নির্গত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তোমার অস্থির নয়নশরঘাতে বিষম জ্বরাতুর হইয়া বিরহিণী পদ্মশয়ন অবলম্বন করিয়াছেন। রাধামোহন কহিতেছেন, যাহাকে পঞ্চবান লাগে তাহার এরূপ আচরণ কিছুই অপরূপ নহে।

এ স্থলে পহুঁ শব্দের কী অর্থ হইতেছে। 'রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন' এরূপ অর্থ অসংগত। কারণ, কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক। 'রাধামোহন কহিতেছেন হে

প্রভু’ এরূপ অর্থও এ স্থলে ঠিক খাটে না; কারণ, সেরূপ অর্থ হইলে পঁহু শব্দ পরে বসিত—তাহা হইলে কবি সম্ভবত ‘রাধামোহন কহে অপরূপ নহে পঁহু’ এইরূপ শব্দবিন্যাস ব্যবহার করিতেন।

যুগলমূর্তি বর্ণনায় গোবিন্দদাস কহিতেছেন :

ও নব পদুমিনী সাজ,
ইহ মত্ত মধুকর রাজ।
ও মুখ চন্দ উজোর,
ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

এখানে ভণিতার অর্থ :

অরুণের নিকট চাঁদ দেখিয়া গোবিন্দদাসের ধাঁদা লাগিয়াছে।

গোবিন্দদাসের প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে এ কথা বলা যায় না, কারণ তিনিই বর্ণনার বিষয়। এখানে পঁহু সম্বোধন পদ নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

শ্যামের সেবাসমাপনান্তে রাধিকা সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন :

সখীগণ মেলি করল জয়কার,
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।
নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়াণ,
ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী,
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয় কার,
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়
গোবিন্দদাস পহু এহ রস গায়।

এখানেও পঁহু অর্থে প্রভু অথবা বঁধু অসংগত।

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ,
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।

গোধন গরজত বড়ই গভীর
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।
গোরস ধীর ধীর বিরাজিত অঙ্গ,
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ।
মুটকি মুটকি ভরি রাখত ধারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু নিরীক্ষণ করিতেছেন' এরূপ অর্থ হয় না; কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি দোহনে নিযুক্ত।

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস পঁহু।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু গান গাহিতেছেন' ঠিক হয় না : কারণ, তাঁহার মুখে মোহন মুরলী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখচন্দ।...
গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীজন
গুরুজন সেবন ফেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন
বেলি অবসান ভৈ গেলি।

এই পদে কেবল রাধিকার গৃহের কথা হইতেছে; তিনি ক্রমে ক্রমে গৃহকার্য এবং ভোজনাদি সমাধা করিলেন এবং সন্ধ্যা হইল—কবি ইহাই দর্শন এবং বর্ণনা করিতেছেন। এখানে শ্যাম কোথায় যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, 'হে গোবিন্দদাসের বঁধু, বেলা গেল সন্ধ্যা হল।'

আমি কেবল নির্দেশ করিতে চাহি যে, গোবিন্দদাসের এবং দুই-এক স্থলে রাধামোহন দাসের পদাবলীতে পঁহু পহুঁ বা পহু—প্রভু ও বঁধু অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কী অর্থে হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতির নোটে অক্ষয়বাবু এক স্থলে পহু অর্থে পুনঃ লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্থ নিতান্ত অনুমানমূলক না মনে করিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পুনঃ অর্থ সংগত হয়। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে ‘ভণে’ অর্থ না করিয়া পুনঃ অর্থ করিলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে; যেমন, গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন ইত্যাদি।

এই কারণে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া আছি। ভণহুঁ এবং পুনহুঁ এই দুই শব্দ হইতেই যদি পহুঁ-র উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে স্থানভেদে এই দুই অর্থই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর-কোনো বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পহুঁ শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি; আপনি মিথিলা প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে; এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোনো পুঁথিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়ার্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও পঁহু দেখি নাই; এবং কিছুকাল পূর্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই।

ভাষাবিচ্ছেদ

ইংরেজের রাজচক্রবর্তীত্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।
প্রথমত, এক রাজার শাসনপ্রণালীর বন্ধন তো আছেই, তাহার পরে পথের সুগমতা এবং বাণিজ্য ব্যাবসা ও চাকরির টানে পরস্পরের সহিত নিয়ত সম্মিলন ঘটিতেছেই।

ইহার একটা অনিবার্য ফল এই ছিল যে, যে-সকল প্রতিবেশী জাতির মধ্যে প্রভেদ সামান্য তাহারা ক্রমশ এক হইয়া যাইতে পারিত। অন্তত ভাষা সম্বন্ধে তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল।

উড়িষ্যা এবং আসামে বংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলায় এই দুই উপবিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।

সামান্য অন্তরাল এইজন্য বলিতেছি যে, বাংলাভাষার সহিত আসামি ও উড়িষ্যার যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে-প্রভেদ, বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।

অবশ্য, উপভাষা আপন জন্মস্থান হইতে একেবারে লুপ্ত হয় না। তাহা পূর্বপুরুষের রসনা হইতে উত্তরপুরুষের রসনায় সংক্রামিত হইয়া চলে। কিন্তু লিখনভাষা যত বৃহৎ পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বৃটিশ দ্বীপে স্কটল্যান্ড, অয়র্ল্যান্ড ও ওয়েল্‌সের স্থানীয় ভাষা ইংরেজি সাধুভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংরেজির উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষাসকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিস্তৃত নহে। কিন্তু ইংরেজের বল জয়ী হওয়ায় প্রবল ইংরেজিভাষাই বৃটিশ দ্বীপের সাধুভাষারূপে গণ্য হইয়াছে। এই ভাষার ঐক্যে বৃটিশজাতি যে উন্নতি ও বললাভ করিয়াছে, ভাষা পৃথক থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।

ভারতবর্ষে যে যে সমশ্রেণীর ভাষার একীভবন স্বাভাবিক অথবা স্বল্পচেষ্টাসাধ্য, সেগুলিকে এক হইতে দিলে আমাদের ব্যাপক ও স্থায়ী উন্নতির পথ প্রসর হইত।

কিন্তু, যদিচ একীকরণ ইংরেজরাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।

স্থানীয় চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালির বিরুদ্ধে যে-গণ্ডি টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বেহারি প্রভৃতি বঙ্গশাখীদের সহিত বাঙালির যে-একটি ঈর্ষার সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা আমরা স্বল্প অশুভেরই কারণ মনে করি; কিন্তু ভাষার ঐক্য যাহা নিত্য, যাহা সুগভীর, যাহা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহাকে আপন রাজশক্তির দ্বারা পরাহত করিয়া ইংরেজ আমাদের নিরুপায় দেশকে চিরদিনের মতো ভাঙিয়া রাখিতেছেন।

ইংরেজিভাষা কোনো উপায়েই আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত উৎকট বিদেশী। এবং যে-সকল ভাষার ভিত্তি বহুসহস্র বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যেসেকল ভাষা বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনোই মরিবার নহে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতমূলক ভাষা রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাধায় শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্ররূপে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের জয়চেষ্টার অবসর হয় নাই।

এক্ষণে সেই অবসরের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাংলাভাষার পরাভবের কোনো আশঙ্কা নাই।

প্রথমত, বাঙালিভাষীর জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অপরভাষীর তুলনায় অধিক। প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাংলা বলে।

কিন্তু আপন সাহিত্যের মধ্যে বাংলা যে-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহাতেই তাহার অমরতা সূচনা করে।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া বোধ হয় এমন কোনো ভাষাই নাই, যে-ভাষার আধুনিক সাহিত্যে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই সজাগ ঔৎসুক্য। অন্যত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্যই দেশীয় ভাষা প্রধানত অবলম্বনীয় জ্ঞান করেন —কিন্তু তাঁহাদের মনের শ্রেষ্ঠভাব ও নূতন উদ্ভাবন সকলকে তাঁহারা ইংরেজিভাষায় রক্ষা করিতে ব্যগ্র।

বাংলাদেশে ইংরেজিতে প্রবন্ধরচনার প্রয়াস প্রায় তিরোধান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যে-সকল ছাত্রের রচনা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাংলাসাহিত্য অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, আমাদের সাহিত্য এমন-একটি সবেগতা, এমন-একটি প্রবলতা লাভ করিয়াছে। চতুর্দিকে জীবনদান এবং জীবনগ্রহণ করিবার শক্তি ইহার জন্মিয়াছে। ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে। এবং বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যেদেশ দিয়া যায় সে-দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বাণিজ্যে ও ধনে-ধান্যে ধন্য হইয়া উঠে, তেমনই ভারতবর্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলাভাষার ব্যাপ্তি হইবে ততদূর পর্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই উপকূলকে নিত্য নব নব ভাবসম্পদে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখনপঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনিই সেই দেশের পক্ষেও।

কিন্তু ইংরেজের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠবিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলাপ্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষার জয়কীর্তন করিতেছেন।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দেশীয় ভাষা আমাদের রাজভাষা নহে, যে-ভাষার সাহায্যে বিদ্যালয়ের উপাধি বা মোটা বেতন লাভের আশা নাই। অতএব দেশীয় সাহিত্যের একমাত্র ভরসা তাহার প্রজাসংখ্যা, তাহার লেখক ও পাঠক-সাধারণের ব্যাপ্তি। খন্ড বিচ্ছিন্ন দেশে কখনোই মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না। তাহা সংকীর্ণ গ্রাম্য প্রাদেশিক আকার ধারণ করে। তাহা ঘোরো এবং আটপৌরে হইয়া উঠে, তাহা মানবরোজদরবারের উপযুক্ত নয়।

আসামি এবং উড়িয়া যদি বাংলার সগোত্র ভাষা না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার কোনো অধিকার থাকিত না। বিশেষত শব্দভাণ্ডারের দৈন্যবশত সাধুসাহিত্যে লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য, অতএব সাহিত্যগ্রাহ্য ভাষায়

অনৈক্য আরো সামান্য। লেখক কটকে বাসকালে উড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাধুবাংলার প্রভেদ তর্জনীর সহিত মধ্যম অঙ্গুলির অপেক্ষা অধিক নহে।

একটি উড়িয়া ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র কাহিনী এখানে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম। কোনো বাঙালিকে ইহার অর্থ বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

কেতে বেলে এক হরিণ। পীড়িত হেবারু তাহার আত্মীয় ও পরিবারীয় পশুগণ তাকু দেখিবা নিমন্তে আসি চারিদিগরে শুষ্ক ও সরস যেতে তৃণ পল্লবিথিলা, তাহা সবু খায়ি পকাইলা। হরিণর পীড়ার শান্ত হেলা-উত্তারু সে কিচ্ছি আহার করিবা নিমন্তে ইচ্ছা কলা। মাত্র কিছিহি খাদ্য পাইলা নাহিঁ, তহিঁ রে ক্ষুধারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হেলা। ইহার তাৎপর্য এহি- অবিবেচক বন্ধু থিবাঠারু বরং বন্ধু ন থিবা ভল।

ইংরেজ লেখকগণ বাংলার এই-সকল উপভাষাগুলিকে স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন তাহা যে কতদূর অসংগত ডাক্তার ব্রাউন-প্রণীত আসামি ব্যাকরণ আলোচনা করিলে তাহা দেখা যায়।

তিনি উচ্চারণপ্রভেদের যে-যুক্তি দিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিলে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়। আসামিরা চ-কে দন্ত্য স (ইংরেজি ড়) জ-কে দন্ত্য জ (ইংরেজি।) রূপে উচ্চারণ করে, পূর্ববাংলাতেও সেই নিয়ম। তাহারা শ-কে হ বলে, পূর্ববঙ্গেও তাই। তাহারা বাক্য-কে ‘বাইক্য’, মান্য কে ‘মাইন্য’ বলে, এ সম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের সহিত তাহার প্রভেদ দেখি না।

ব্রাউন বলিয়াছেন, উচ্চারণের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলে আসামির সহিত হিন্দুস্থানির ঐক্য পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতমূলক শব্দের আসামি উচ্চারণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আসামি বাংলা হইতে জাত হয় নাই।

অথচ আশ্চর্য এই যে, মূর্ধন্য ষ আসামি ভাষায় খ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, ইহা ছাড়া আসামির সহিত হিন্দুস্থানির আর-কোনো সাদৃশ্য নাই এবং তাহার সমস্ত সাদৃশ্যই বাংলার সহিত।

অকারের বিশুদ্ধ উচ্চারণই হিন্দুস্থানির প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুস্থানিতে বট শব্দ ইংরেজি but শব্দের অনুরূপ, বাংলায় তাহা ইংরেজি bought শব্দের ন্যায়। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য গৌড়ীয় উচ্চারণের সহিত প্রাচ্য গৌড়ীয়ের এই সর্বপ্রধান প্রভেদ। আসামি ভাষা এ সম্বন্ধে

বাংলার মতো। ঐকারের উচ্চারণেও তাহা দেখা যায়। বাংলা ‘ঐ’ ইংরেজি stoic শব্দের oi, হিন্দি ‘ঐ’ ইংরেজি style শব্দের y। ঔ শব্দও তদ্রূপ।

বাংলার অকার উচ্চারণ স্থানবিশেষে, যথা, ইকার উকারের পূর্বে হ্রস্ব ওকারে পরিণত হয়। কল, কলি ও কলু শব্দের উচ্চারণভেদ আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আসামি ভাষার উচ্চারণে বাংলার এই বিশেষত্ব আছে।

আসামিতে ইকারের পূর্বে ওকার পরিণত হয়, যথা ‘বোলে’ ক্রিয়া (বাংলা, বলে) বিভক্তিপরিবর্তনে ‘বুলিছে’ হয়। বাংলাতেও, খোলে খুলিছে, দোলে দুলিছে। বোল বুলি, খোল খুলি, ঝোলা ঝুলি, গোলা গুলি, ইত্যাদি।

যুক্ত অক্ষরের উচ্চারণেও প্রভেদ দেখি না, আসামিরাও স্মরণ-কে স্বরণ, স্বরূপ-তে সরূপ, পক্ষী-কে পক্‌খী বলে।

অন্ত্যস্থ ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বাংলাতেও এই উচ্চারণ আছে, কিন্তু বর্গীয় ব ও অন্ত্যস্থ ব-এ অক্ষরের ভেদ নাই, আসামিতে সেই ভেদচিহ্ন আছে। তাহা বলিয়া এ কথা কেহ মনে করিবেন না, মহারাষ্ট্রিদের ন্যায় আসামিরা সংস্কৃতশব্দে অন্ত্যস্থ ও বর্গীয় ব-এর প্রভেদ রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেখানে ‘পাওয়া’ লিখি আসামিরা সেখানে ‘পবা’ লেখে। আমাদের ওয়া এবং তাহাদের বা উচ্চারণে একই, লেখায় ভিন্ন।

যাহাই হউক, যে-ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত, তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরস্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে-চেষ্টা তাহাকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।

উপসর্গ-সমালোচনা

মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চালনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাতপায়েরই সামিল। তেমনই য়ুরোপীয় আর্যভাষার prefix ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষার প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ‘উপসর্গের অর্থবিচার’ নামক প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের প্রতি নূতন করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। লেখক আমাদের মান্য গুরুজন সে একটা কারণ বটে, কিন্তু গুরুতর কারণ এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে যে অসামান্য গবেষণা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের মতো অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় ‘উপসর্গের অর্থ বিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা’ আখ্যা দিয়া এক রচনা বাহির করিয়াছেন। সেই রচনায় তিনি প্রবন্ধলেখকের মতের কেবলই প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কোথাও সমর্থনযোগ্য শ্রদ্ধেয় কোনো কথা আছে এমন আভাসমাত্র দেন নাই।

এ সম্বন্ধে পাঠকদিগকে একটিমাত্র পরামর্শ দিয়া আমরা সংক্ষেপে কর্তব্যসাধন করিতে পারি, সে আর কিছুই নহে, তাঁহারা একবার সমালোচিত প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনা একত্র করিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলে উভয় প্রবন্ধের ওজনের প্রভূত প্রভেদ বুঝিতে তাঁহাদের ক্ষণমাত্র

বিলম্ব হইবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানি, অনেক পাঠকই শ্রমস্বীকারপূর্বক আমাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না, সুতরাং নানা কারণে সংকোচসত্ত্বেও উপসর্গঘটিত আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, উপসর্গের অর্থবিচার সম্বন্ধে তিনি একটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এবং সে-পথ তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত কোনো গোপন পথ নহে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ। তিনি দৃষ্টান্তপরম্পরা হইতে সিদ্ধান্তে নীত হইয়া উপসর্গগুলির অর্থ-উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফল সর্বত্র না-ও যদি হয়, তথাপি সেই প্রণালী একমাত্র সমীচীন প্রণালী।

প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে এইপ্রকার প্রণালী অবলম্বনে উপসর্গের অর্থনির্ণয় হইয়াছিল বলিয়া জানি না। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, “আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই উপসর্গের ধাতুভেদে প্রয়োগভেদে নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ঐ-সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (generalize) করিয়া তাঁহারা এক-একটি উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন।” কথা এই যে, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ না থাকায় তাঁহাদের কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি, পরখ করিয়া লইতে পারি না। এ সম্বন্ধে দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। মেদিনীকোষকার অপ উপসর্গের নিম্নলিখিত অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন—অপকৃষ্টার্থ; বর্জনার্থঃ, বিয়োগঃ, বিপর্যয়ঃ, বিকৃতিঃ, চৌর্যং, নির্দেশঃ, হর্ষঃ। আমাদের মনে প্রথমে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, যে-অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তাহা উপসর্গ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিরূপে হয়। অপ উপসর্গের চৌর্য অর্থ সহজেই সংগত বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য অপচয় বা অপহরণ শব্দে চৌর্য অর্থ প্রকাশ করে, অপ উপসর্গের অপকৃষ্টার্থই তাহার কারণ। হরণ শব্দের অর্থ স্থানান্তরকরণ, চয়ন শব্দে গ্রহণ বুঝায়; অপ উপসর্গযোগে তাহাতে দূষিত ভাবের সংস্রব হইয়া চৌর্য অর্থ নিষ্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় ভাষায় abduction শব্দের অর্থ অপহরণ—ducere ধাতুর অর্থ নয়ন, তাহার সহিত ab(অপ) উপসর্গ যুক্ত হইয়া নীচার্থে চৌর্য বুঝাইতেছে। অপ উপসর্গের হর্ষ অর্থ সম্বন্ধেও আমাদের ঐরূপ সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রাচীন শব্দাচার্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া এই-সকল অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না; সুতরাং হয় তাঁহার কথা তর্কের অতীত বলিয়া

মানিয়া লইতে হয়, নয়তো বিতর্কের মধ্যেই থাকিতে হয়। দুর্গাদাস সং উপসর্গের নানা অর্থের মধ্যে 'ঔচিত্য' অর্থ নির্দশন করিয়াছেন। অবশ্য, সমুচিত শব্দের দ্বারা ঔচিত্য ব্যক্ত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহাতে সং উপসর্গের ঔচিত্য অর্থ সূচনা করে না। সংগতি, সমীচীনতা, সমীক্ষকারিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অভ্যন্তরে ইঙ্গিতে ঔচিত্যের ভাব আছে, সং উপসর্গই তাহার মুখ্য ও মূল কারণ নহে। এরূপ বিচার করিতে গেলে উপসর্গের অর্থের অন্ত পাওয়া যায় না; তাহা হইলে বলা যাইতে পারে সং উপসর্গের অর্থ সম্মান এবং প্রমাণস্বরূপ সম্মান, সমাদর, সম্ভ্রম, সমভ্যর্থন প্রভৃতি উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। দুর্গাদাস সং উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন সম্ প্রকর্ষাশ্লেষনৈরন্তর্যৌচিত্যাভি মুখ্যেষু; এই আভিমুখ্য অর্থ স্পষ্টতই সং উপসর্গের বিশেষ অর্থ নহে—কারণ, সং উপসর্গের যে আশ্লেষ অর্থ দেওয়া হইয়াছে আভিমুখ্য তাহার একটি অংশ, বৈমুখ্যও তাহার মধ্যে আসিতে পারে। সমাবেশ, সমাগম, সংকুলতা বলিলে যে আশ্লেষ বা একত্র হওন বুঝায় তাহার মধ্যে—আভিমুখ্য, বৈমুখ্য, উন্মুখতা, অধোমুখতা, সমস্তই থাকিতে পারে; এ স্থলে বিশেষভাবে আভিমুখ্যের উল্লেখ করাতে অন্যগুলিকে নিরাকৃত করা হইয়াছে। যে-জনতায় নানা লোক নানা দিকে মুখ করিয়া আছে, এমন-কি, কেহ কাহারো অভিমুখে নাই তাহাকেও জনসমাগম বলা যায়; কারণ, সং উপসর্গের মূল অর্থ আশ্লেষ, তাহার মধ্যে আভিমুখ্য থাকিলেও চলে না-থাকিলেও চলে। ইহাও দেখা যাইতেছে, উপসর্গ সম্বন্ধে প্রাচীন শব্দাচার্যদিগের অর্থতালিকায় পরস্পরের মধ্যে অনেক কমবেশি আছে। মেদিনীকোষকার সং উপসর্গের যে 'শোভনার্থ' উল্লেখ করিয়াছেন দুর্গাদাসের টীকায় তাহা নাই; দুর্গাদাসের ঔচিত্য আভিমুখ্য অর্থ মেদিনীকোষে দেখা যায় না। এই-সকল শব্দাচার্যের অগাধ পাণ্ডিত্য ও কুশাগ্রবুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর দ্বারা পরীক্ষা করা কর্তব্য, এ সম্বন্ধেও সংশয় করা উচিত নহে।

প্রাচীন শব্দাচার্যগণ সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধকারের ন্যায় এক-একটি উপসর্গের সর্বত্রই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না।" প্রবন্ধকারও কোথাও তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি উপসর্গগুলির মূল অর্থ সন্ধান করিতেছেন এবং সেই

এক অর্থ হইতে নানা অর্থের পরিমাণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় e (ই) উপসর্গের একটা অর্থ অভাব, আর-এক অর্‌থ বহির্গমতা; educate শব্দের উৎপত্তিমূলক অর্থ বহির্নয়ন, edit শব্দের অর্থ বাহিরে দান, edentate শব্দের অর্থ দন্তহীন; কেহ যদি দেখাইয়া দেন যে, ন উপসর্গের মূল অর্থবহির্গমতা এবং তাহা হইতেই অভাব অর্থের উৎপত্তি, অর্থাৎ যাহা বাহির হইয়া যায় তাহা থাকে না, তবে তিনি e উপসর্গের বহু অর্থ স্বীকার করেন না এ কথা বলা অসংগত। অন্তর শব্দের এক অর্থ ভিতর, আর-এক অর্থ ফাঁক; যদি বলা যায় যে, ঐ ভিতর অর্থ হইতেই ফাঁক অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ দুই সীমার ভিতরের স্থানকেই ফাঁক বলা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা অন্তর শব্দের দুই অর্থ অস্বীকার করা হয় না। পরন্তু তাহার মূল অর্থ যে দুই নহে, এক, এই কথাই বলা হইয়া থাকে; এবং মূল অর্থের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিলে সাধারণত শব্দের প্রয়োগ এবং তাহার রূপান্তরকরণ যথামত হইতে পারে; এ কথাও অসংগত নহে। বস্তুত গুঁড়ি একটা হয় এবং ডাল অনেকগুলি হইয়া থাকে, ভাষাতত্ত্বের পদে পদে এ নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। একই ধাতু হইতে ঘৃণা, ঘৃত, ঘর্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্রার্থক শব্দের উৎপত্তি হইলেও মূল ধাতুর অর্থভেদ কল্পনা করা সংগত নহে। বরঞ্চ এক ধাতুমূলক নানা শব্দের মধ্যে যে-অংশে কোনো-একটা ঐক্য পাওয়া যায়, সেইখানেই ধাতুর মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তেমনই এক উপসর্গের নানা অর্থভেদের মধ্যে যদি কোনো ঐক্য আবিষ্কার করা যায়, তবে সেই ঐক্যের মধ্যে যে সেই উপসর্গের আদি অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা স্বভাবত মনে উদয় হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ব্যাপ্তিসাধন প্রণালী দ্বারা (Generalization) উপসর্গের বিচিত্র ভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে এক মূল অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এই প্রথম চেষ্টা। সুতরাং সে-চেষ্টার ফল নানাস্থানে অসম্পূর্ণ থাকাই সম্ভব এবং পরবর্তী আলোচকগণ নব নব দৃষ্টান্ত ও তুলনার সহায়তায় উক্ত প্রবন্ধের সংশোধন ও পরিপোষণ করিয়া চলিবেন আশা করা যায়। বস্তুত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত আর্যভাষার তুলনা করিয়া না দেখিলে উপসর্গের অর্থ বিচার কখনোই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং উহার মধ্যে অনেক অংশ কাল্পনিক থাকিয়া যাইতে পারে; সেইরূপ তুলনামূলক সমালোচনাই এরূপ প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট সমালোচনা প্রাচীন শব্দাচার্য এইরূপ মত দিয়াছেন, এ কথা বলিয়া সমালোচনা করা চলে না।

প্রবন্ধকার মহাশয় প্রশ্বাস নিশ্বাস, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, প্রবাস নিবাস, প্রবেশ নিবেশ, প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রভৃতি দৃষ্টান্তযোগে প্র এবং নি উপসর্গের মূল অর্থনির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্র উপসর্গের লক্ষ সম্মুখের দিকে বাহিরের দিকে, নি উপসর্গের লক্ষ ভিতরের দিকে।

ইহাদের সমশ্রেণীর য়ুরোপীয় উপসর্গও তাহার মত সমর্থন করিতেছে। Projection, injection; progress, ingress; induction, production; install, forestall; জর্মানভাষায় einfuhren—to introduce, vorfurfuhren—to produce। এরূপ দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

প্র, নি; pro, in এবং vor, ein এক পর্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সমালোচক মহাশয় এক ‘নিশ্বাস’ শব্দ লইয়া প্রবন্ধকারের মত এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিশ্বাস শব্দ প্রশ্বাস শব্দের বৈপরীত্যবাচক নহে। তিনি প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না, তাহা বহির্গামী শ্বাস। সেইসঙ্গে বলিয়াছেন, “নিশ্বাস এই শব্দটি কোনো কোনো স্থলে ‘নিঃশ্বাস’ এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিত হয়, কিন্তু উভয় শব্দেরই অর্থ এক।”

স যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হইয়া থাকে তখন তৎপূর্বে বিসর্গ লিখিলেও চলে, না লিখিলেও চলে; যথা, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, প্রাতস্নান। কিন্তু তাই বলিয়া নি উপসর্গ ও নিঃ উপসর্গ এক নহে, এমন-কি, তাহাদের বিপরীত অর্থ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমাণসহ তাহার বিচার করিয়াছেন। নি উপসর্গের গতি ভিতরের দিকে, নিঃ উপসর্গের গতি বাহিরের দিকে। নিবাস এবং নির্বাসন তাহার একটা দৃষ্টান্ত। নিঃ উপসর্গের না-অর্থ গৌণ, তাহার মুখ্যভাব বহির্গামিতা। নির্গত শব্দের অর্থ না-গত নহে, তাহার অর্ত বাহিরে গত। নিঃসৃত, বহিঃসৃত। নিষ্ক্রমণ, বহিষ্ক্রমণ। নির্ঘোষ, বহির্ব্যাপ্ত শব্দ। নির্ঝর, বহিরুদ্‌গত ঝরণা। নির্মোক, খোলস যাহা বাহিরে ত্যক্ত হয়। নিরতিশয় অর্থে, যে অতিশয় বাহিরে চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ আপনাকেও যেন অতিক্রম করিতেছে। য়ুরোপীয় e এবং ex উপসর্গে দেখা যায় তাহাদের মূল বহির্গমন অর্থ হইতে অভাব অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। নিঃ উপসর্গেও তাহাই দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম, শব্দস্তোমমহানিধি প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধানে দেখা যায় অভাবার্থক নিঃ উপসর্গকে নির্গত শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; যথা নিরর্গল—নির্গতমর্গলং যস্মাৎ, নিরর্থক—নির্গতোহর্থো যস্মাৎ ইত্যাদি। অ এবং অন্‌ প্রয়োগের দ্বারা বিশুদ্ধ অভাব বুঝায়, কিন্তু নিঃ প্রয়োগে ভাব হইতে বহিশ্চ্যুতি বুঝায়। জর্মান ভাষায় ইহার স্বজাতীয় উপসর্গ—hin। নিঃ

উপসর্গের বিসর্গ স্থানচ্যুতিবশত হি রূপে ন-এর পূর্বে বসিয়াছে, অথবা মূল আর্য ভাষায় যে-ধাতু ছিল তাহাতে হি পূর্বে ছিল, সংস্কৃতে তাহা বিসর্গরূপে পরে বসিয়াছে। Hin উপসর্গেরও বহির্গমতা এবং অভাব অর্থ দেখা যায়। জর্মান অভিধান hin উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলে, motion or direction from the speaker, gone, lost। সংস্কৃতে যেমন নি ভিতর এবং নিঃ বাহির বুঝায়, জর্মান ভাষায় সেইরূপ ein ভিতর এবং hin বাহির বুঝায়। Einfathren অর্থ ভিতরে আনা, hinfahren শব্দের অর্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া। লাটিন in উপসর্গে নি এবং নিঃ, ein এবং hin একত্রে সংগত হইয়াছে। innate অর্থ অন্তরে জাত, infinite অর্থ যাহা সীমার অতীত।

যাহাই হউক, প্র উপসর্গের মূল অর্থ বাহিরে, অগ্রভাগে; নি উপসর্গের অর্থ ভিতরে এবং নিঃ উপসর্গের অর্থ ভিতর হইতে বাহিরে। অতএব নিঃ উপসর্গযোগে যে-শ্বাসের অর্থ বহির্গামী শ্বাস হইবে, নি উপসর্গযোগে তাহাই অন্তর্গমনশীল শ্বাস বুঝাইবে। অথচ ঘটনাক্রমে শ্বাস শব্দের পূর্বে নিঃ উপসর্গের বিসর্গ লোপপ্রবণ হইয়া পড়ে। অতএব এ স্থলে বানানের উপর নির্ভর করা যায় না। ফলত সংস্কৃত ভাষায় বাহ্যবায়ুগ্রহণ অর্থে সাধারণত উপসর্গহীন শ্বাস শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় শব্দই অন্তর্বায়ুর নিঃসারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

দেখা গেল, ‘উপসর্গের অর্থবিচার’ প্রবন্ধে প্র এবং নি উপসর্গের যে-অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে, নিশ্বাস শব্দের আলোচনায় তাহার কোনো পরিবর্তন ঘটিতেছে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দ লইয়া সমালোচক মহাশয় বিস্তর সূক্ষ্ম তর্ক করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণ ও আলোচনা বিরক্তিজনক ও নিষ্ফল হইবে বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। পাণ্ডিত্য অনেক সময় দুর্গম পথ সৃষ্টি করে এবং সত্য সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলে। এ কথা অত্যন্ত সহজ যে, প্রবৃত্তি প্রবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা বাহিরের দিকে ধাবিত হয়; নিবৃত্তি নিবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে।

সমালোচক মহাশয় প্রবৃত্তিনিবৃত্তির এই সহজ উপপত্তি পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ জেদ করিয়া কষ্টকল্পনার পথে গিয়াছেন। তিনি বলেন, “প্রবৃত্তি কি, না প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ ভালো করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্বদবস্থা) (state of action) কোনো বস্তুর স্থিতির বা সত্তার প্রকৃষ্‌ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে।” ক্রিয়ার অবস্থাই যে ভালোরূপ

থাকার অবস্থা এ কথা স্বীকার করা কঠিন। নিবৃত্তি শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তাহাও সংগত হয় নাই। তিনি বলেন, “নিতরাং বর্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণভাবে বেষ্টাদিশূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টাবিরাম।”

সমালোচক মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া উত্তেজনায় নিজেকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ কুর্বদবস্থায় লইয়া গেছেন—এ সম্বন্ধে আর-একটু নিতরাং বর্তন করিতেও পারিতেন; কারণ প্রাচীন শব্দাচার্যগণও নি উপসর্গের অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, যথা, মেদিনীকোষে নি অর্থে “মোক্ষঃ, অন্তর্ভাবং বন্ধনম্” ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু পাছে সেই অর্থ স্বীকার করিলে কোনো অংশে প্রবন্ধকারের সহিত ঐক্য সংঘটন হয়, এইজন্য যত্নপূর্বক তাহা পরিহার করিয়াছেন; ইহা নিশ্চয় একটা প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃষ্টাবৃত্তির কার্য।

নি উপসর্গ অর্থে নিতরাং কেন হইল। বস্তুত নি, প্র, পরি, উৎ প্রভৃতি অনেক উপসর্গেরই আধিক্য অর্থ দেখা যায়। ইহার কারণ, আধিক্যের নানা দিক আছে। কোনোটা বা বাহিরে বহুদূর যায়, কোনোটা ভিতরে, কোনোটা পার্শ্বে, কোনোটা উপরে। অত্যন্ত পাণ্ডিত্যকে এমনভাবে দেখা যাইতে পারে যে, তাহা পণ্ডিতমহাশয়ের মনের খুব ভিতরে তলাইয়া গিয়াছে, অথবা তাহা সকল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে চলিয়া গিয়াছে, অথবা তাহা রাশীকৃত হইয়া পর্বতের ন্যায় উপরে চড়িয়া গিয়াছে, অথবা তাহা নানা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কালক্রমে এই-সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়া সর্বপ্রকার আধিক্যকেই উক্ত যে-কোনো উপসর্গ দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে ব্যক্ত করা প্রচলিত হইয়াছে। যদিচ উৎ উপসর্গের ঊর্ধ্বগামিতার ভাব সুস্পষ্ট, এবং উৎপত্তি অনুসারে ‘উদার’ শব্দে বিশেষরূপে উচ্চতা ও উন্নতভাবই প্রকাশ করে, তথাপি জয়দেব রাধিকার পদপল্লবে উদার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাহার একান্ত গৌরব সূচনা করিয়াছেন মাত্র। অতএব নানা উপসর্গে যে একই ভৃশার্থ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা সেই উপসর্গ গুলির ভিন্ন ভিন্ন নানা মূল অর্থেরই সমর্থন করে। অনেক স্থলেই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সময় উক্ত উপসর্গগুলির মূল অর্থ অথবা ভৃশার্থ দু-ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা, নিগূঢ় অর্থে অত্যন্ত গূঢ় অথবা ভিতরের দিকে গূঢ় দু-ই বলা যায়, intense অত্যন্তরূপে টানা অথবা ভিতরের দিকে টানা, উন্মত্ত অত্যন্ত মত্ত অথবা ঊর্ধ্বদিকে মত্ত অর্থাৎ মত্ততা ছাপাইয়া উঠিতেছে, concentrate অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত অথবা এরূপ স্থলে কেহ যদি বলেন, অত্যন্ত একত্রে কেন্দ্রীভূত। অর্থের বিকল্পে অন্য অর্থ আমি স্বীকার করিব না, তবে তাঁহার সহিত বৃথা বিতণ্ডা করিতে ক্ষান্ত থাকিব। সমালোচক মহাশয় ইহাও আলোচনা করিয়া

দেখিবেন, প্রতি অনু আং প্রভৃতি উপসর্গে নিতরাং প্রকৃষ্ট সম্যক্ প্রভৃতি ভৃশার্থ বুঝায় না, তাহার মুখ্য কারণ ঐ-সকল উপসর্গে দূরত্ব বুঝাইতে পারে না।

যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষার উপসর্গের সহিত য়ুরোপীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলির যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের উৎপত্তিস্থল যে একই, সমালোচক মহাশয় বোধ করি তাহা অস্বীকার করেন না। সংস্কৃত উপসর্গগুলির প্রচলিত নানা অর্থের মধ্যে যে-অর্থ ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান, তাহাকেই মূল অর্থ বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে। এইরূপ আর্যভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে-পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। যাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই সম্ভবে না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয় করিয়া কয়েকটি কথা বলিব, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা যোগ্যতর লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এই আশা করিয়া লিখিতে স্পর্ধিত হইতেছি।

প্র উপসর্গের অর্থ একটা কিছু হইতে বহির্ভাগে অগ্রগামিতা। য়ুরোপীয় উপসর্গ হইতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাভাষায় আইসা এবং পইসা নামক দুইটি ক্রিয়া আছে, তাহা আবিশ্ এবং প্রবিশ্ ধাতুমূলক—তন্মধ্যে পইসা ধাতু পশিল প্রভৃতি শব্দে বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে ও কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং আইসা ধাতু এখনো আপন অধিকার বজায় রাখিয়াছে। আইসা এবং পইসা এই দুটি ধাতুতে আ এবং প্র উপসর্গের অর্থভেদ স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা কেবল দিক্ ভেদ, পইসা বক্তার দিক হইতে অগ্রভাগে এবং আইসা বক্তার দিকের সান্নিধ্যে আগমন সূচনা করে। য়ুরোপীয় আর্যভাষার pro উপসর্গের মুখ্য অর্থ বহির্দিকে অগ্রগামিতা এ কথা সর্ববাদিসম্মত; অতএব এই অর্থ যে মূল প্রাচীন অর্থ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এ কথা স্বীকার্য যে, সূর্যের বর্ণরশ্মির ন্যায় প্র উপসর্গ য়ুরোপীয় ভাষায় নানা উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। pro, pre, per তাহার উদাহরণ। প্রো সম্মুখগামিতা, প্রি পূর্বগামিতা এবং পর্ পারগামিতা অর্থাৎ দূরগামিতা প্রকাশ করে। কাল হিসাবে অগ্রবর্তিতা বক্তার মনের গতি অনুসারে পশ্চাৎকালেও খাটে সম্মুখকালেও খাটে, এই কারণে ‘প্রাচীন’ শব্দে ‘প্র’ উপসর্গ অসংগত হয় না। পুরঃ এবং পুরা শব্দে ইহার অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। উভয় শব্দের একই

উৎপত্তি হইলেও পুরঃ শব্দ দেশ হিসাবে নিকটবর্তী সম্মুখস্থ দেশ এবং পুরা শব্দ কাল হিসাবে দূরবর্তী অতীত কালকে বুঝায়। পূর্ব শব্দেরও প্রয়োগ এইরূপ। পূর্বস্থিত পদার্থ সম্মুখে বর্তমান, কিন্তু পূর্বকাল অতীতকাল। অতএব প্রাচীন শব্দাচার্যগণ যে প্র উপসর্গের 'প্রাথম্যং' এবং 'আরম্ভঃ' অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অগ্রগামিতা অর্থেরই রূপভেদ মাত্র। লাটিন ভাষায় তাহাই প্রো এবং প্রি দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রীক প্রো উপসর্গে প্রাথম্য অর্থও সূচিত হয়, যথা prologue; অপর পক্ষে সম্মুখগমতাও ব্যক্ত করে, যথা proboskis, শুন্ড—উহার উপপত্তিমূলক অর্থ প্রভক্ষক, যাহা সম্মুখ হইতে খায়। লাটিন পর্ উপসর্গের অর্থ through, অর্থাৎ একপ্রান্ত হইতে পরপ্রান্তের অভিমুখতা, পারগামিতা। তাহা হইতে স্বভাবতই 'সর্বতোভাব' অর্থও ব্যক্ত হয়। দুর্গাদাস-ধৃত পুরুষোত্তমের মতে প্র উপসর্গের সর্বতোভাব অর্থও স্বীকৃত হইয়াছে।

পরি এবং পরা উপসর্গও এই প্র উপসর্গের সহোদর। প্র উপসর্গ বিশেষরূপে বহির্ব্যঞ্জক। Fro, from, fore, forth প্রভৃতি ইংরেজি অব্যয় শব্দগুলি এই অর্থ সমর্থন করে। পরি এবং পরা উপসর্গেও সেই বাহিরের ভাব, পরভাব, অনাত্মভাব বুঝায়। গ্রীক উপসর্গ peri এবং para, পরি এবং পরা উপসর্গের স্বশ্রেণীয়। গ্রীক ভাষায় পরি উপসর্গে নিকট এবং চতুর্দিক দু-ই বুঝায়। উক্ত উপসর্গ perigee perihelion শব্দে নৈকট্য অর্থে এবং periphery periphrasis শব্দে পরিবেষ্টন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক para উপসর্গেরও একাধিক অর্থ আছে। দূরার্থ, যথা paragoge (addition of a letter or syllable to the end of a word : from para, beyond and ago, to lead), paralogism (reasoning beside or from the point : from para, beyond and logismos, discourse)। Para উপসর্গের আর-একটি অর্থ পাশাপাশি, কিন্তু সে-পাশাপাশি নিকট অর্থে নহে, সংলগ্ন অর্থে নহে, তাহাতে মুখ্যরূপে বিচ্ছেদভাবই প্রকাশ করে। Parallel অর্থে যাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে কিন্তু ঘেঁষাঘেঁষি নহে; এমন-কি, মিলন হইলেই 'প্যারালাল'ত্ব ব্যর্থ হইয়া যায়। Paraphrase অর্থে বুঝায় মূল বাক্যের পাশাপাশি এমন বাক্যপ্রয়োগ যাহারা একভাবাত্মক অথচ এক নহে। Peri উপসর্গে যেমন অবিচ্ছেদ বহির্বেষ্টন বুঝায়, para উপসর্গেও সেইরূপে বাহিরে স্থিতি বুঝায় কিন্তু তাহাতে মধ্যে বিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখে।

প্রতি উপসর্গও প্র উপসর্গের একটি শাখা। প্রতি উপসর্গ প্র উপসর্গের সাধারণ অর্থকে একটি বিশেষ অর্থে সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছে। ইহাতেও প্র উপসর্গের বাহিরের দিকে অগ্রসর হওয়া বুঝায়, কিন্তু সম্মুখভাগে একটি বিশেষ বাধা লক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে। গ্রীক pros এবং প্রাচীন গ্রীক proti উপসর্গ সংস্কৃত প্রতি উপসর্গের একজাতীয়। লাটিন উপসর্গ por(portend) এবং প্রাচীন লাটিন উপসর্গের port-ও এই শ্রেণীভুক্ত। নি, in, einএক পর্যায়গত উপসর্গ। নি এবং in, উপসর্গে অন্তর্ভাব এবং কখনো কখনো অভাব বুঝায়। যাহা ভিতরে চলিয়া যায়, অন্তর্হিত হয়,তাহা আর দেখা যায় না। বস্তুত, নি অন্ত অন্তর, এগুলি একজাতীয়। নি নির্ অন্ত অন্তর, in en (গ্রীক) anti ante ein hin ent, নি ও নিঃ অব্যয় ও উপসর্গগুলিকে এক গণ্ডির মধ্যে ধরা যায়। ইহা দেখা গিয়াছে যে সংস্কৃত ভাষায় নি উপসর্গে যে ইকার পরে বসিয়াছে অধিকাংশ য়ুরোপীয় আর্যভাষাতেই তাহা পূর্বে বসিয়াছে। অ্যাংলোস্যাক্সন ডাচ জর্মান গথ ওয়েলস আইরিশ ও লাটিন ভাষায় in, গ্রীকভাষায় en, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় ন-বর্জিত শুদ্ধমাত্র i দেখা যায়। মূল আর্যভাষার অ স্বরবর্ণ সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে, য়ুরোপীয় আর্যভাষায় তাহা হয় নাই, শব্দশাস্ত্রে এই কথা বলে। অধ্যাপক উইল্‌কিন্স 'গ্রীকভাষা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

But while Graeco-Italic consonants are on the whole the same as those of the primitive tongue, there is a highly important and significant change in the vowel-system. The original a, retained for the most part in Sanskrit, and modified in Zend only under conditions which make it plain that this is not a phenomenon of very ancient date there, has in Europe undergone a change in two directions.

সেই দ্বিবিধ পরিবর্তন এই যে, অ কোথাও e, i এবং কোথাও o,u আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা হইতে এ কথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূল আর্যভাষায় যাহা অন্ ছিল, যুরোপীয় আর্যভাষায় তাহা ইন্ ও এন্ হইয়াছে। লাটিন ইন্ উপসর্গের উত্তর তর প্রত্যয় করিয়া inter intra intro প্রভৃতি শব্দের উদ্ ভব হইয়াছে। সংস্কৃত অন্তর শব্দের সহিত তার সারূপ্য সহজেই হৃদয়ংগম হয়।

এইরূপে অন্ শব্দকেই অন্ত ও অন্তর শব্দের মূল বলিয়া ধরিলে, অভাবাত্মক অ অন্ ন নি, an (Greek) in un শব্দগুলির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়। অন্ত অর্থে শেষ; যেখানে গিয়া কোনো জিনিস ‘না’ হইয়া যায় সেইখানেই তাহার অন্ত। অন্তর অর্থে যেখানে দূর সেখানে অন্তভাবেরই আধিক্য প্রকাশ করে। অন্তর অর্থে যেখানে ভিতর, সেখানেও একজাতীয় শেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গমত্যের অন্ত বুঝাইয়া থাকে। জর্মান ভাষায় unter, ইংরেজি ভাষায় under যদিও অন্তর শব্দের একজাতীয়, তথাপি তাহাতে ভিতর না বুঝাইয়া নিম্ন বুঝায়; যাহা আর-কিছুর নীচে চাপা পড়ে তাহা প্রত্যক্ষগোচরতার অন্তে গমন করে। লাটিন উপসর্গ ante দেশ বা কালের পূর্বপ্রান্ত নির্দেশ করে। সংস্কৃত ভাষায় অন্তর বলিতে ভিতর এবং অন্তর বলিতে বাহির (তদন্তর অর্থে তাহার পরে অর্থাৎ তাহার বাহিরে), অন্তর বলিতে দূর বুঝায়—শেষের ভাব, প্রান্তের ভাব এই-সকল অর্থের মূল।

অতএব নি ও নির্ উপসর্গ এবং তাহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে অন্তের ভাব, অন্তর্ভাব, এবং অন্তর্ধানের ভাব কিরূপে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন নহে। এবং মূল অন্ শব্দ হইতে কিরূপে ন নি নিঃ, in hin en ein প্রভৃতি নানা রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও লক্ষ করিলে দেখা যায়। সংস্কৃত অনু এবং গ্রীক ana, যাহার মুখ্য অর্থ কাহারও পশ্চাদ্‌বর্তিতা এবং গৌণ অর্থ তুল্যতা এবং পৌনঃপুন্য, পূর্বোক্ত অন্ ধাতুর সহিত তাহারও সম্বন্ধ আছে বলিয়া গণ্য করি।

লাটিন de dis এবং সংস্কৃত বি উপসর্গ সম্বন্ধে যুরোপীয় শব্দশাস্ত্রে যে-মত প্রচলিত আছে তাহা শ্রদ্ধেয়। দ্বি (অর্থাৎ দুই) শব্দ সংকুচিত হইয়া দি এবং ভারতে বি রূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার ভাবই এই—খণ্ডিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সেইসঙ্গে নষ্ট হওয়া। joint বা যোগ দুইখানা হইয়া গেলেই disjointed বা বিযুক্ত হইতে হয়। এই খণ্ডীভবনের ভাব হইতেই de এবং বি উপসর্গে deformity বিকৃতির ভাব আসিয়াছি এবং সাধারণ হইতে খণ্ডীকৃত

হইবার ভাব হইতেই বি এবং de উপসর্গের ‘বিশেষত্ব’ অর্থ উদ্‌ভাবিত হইয়াছে।

আ অভি অপি অপ অব অধি এবং অতি উপসর্গগুলিকে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করা যায়। আ উপসর্গের অর্থ নিকটলগ্নতা; ইংরেজি উপসর্গ a (aback, asleep), জর্মান an (ankommen অর্থাৎ আগমন), লাটিন ad, ইংরেজি অব্যয় at সংস্কৃত আ উপসর্গের প্রতিরূপ। এই নৈকট্য অর্থ সংস্কৃত ভাষায় স্থিতি এবং গতি অনুসারে আ এবং অভি এই দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। যাহা নৈকট্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আ এবং যাহা নৈকট্যের চেষ্টা করিতেছে তাহা অভি উপসর্গের দ্বারা ব্যক্ত হয়। অভ্যাগতশব্দে এই দুই ভাব একত্রেই সূচিত হয়; অভি উপসর্গের দ্বারা দূর হইতে নিকটে আসিবার চেষ্টা এবং আ উপসর্গের দ্বারা সেই চেষ্টার সফলতা, উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে। যে-লোক বিশেষ লক্ষ করিয়া দূর হইতে নিকটে আসিয়াছে সে-ই অভ্যাগত। কিন্তু ইহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে স্থানভেদে এই দুই অর্থই ব্যক্ত হয়। A an ad, সংস্কৃত আ এবং অভি উভয় উপসর্গেরই স্থান অধিকার করিয়াছে। Adjacent adjective adjunct শব্দগুলিকে আসন্ন আক্ষিপ্ত আবদ্ধ শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিলে মূল শব্দের তাৎপর্য যথাযথ ব্যক্ত করে। কিন্তু adduce adress advent শব্দ অভিনয়ন অভিদেশ (অভিনির্দেশ) এবং অভিবর্তন শব্দ দ্বারা অনুবাদযোগ্য। সংস্কৃত অধি উপসর্গও এই ad উপসর্গের সহিত জড়িত।

অপ উপসর্গ আ এবং অভির বিপরীত। লাটিন ab, গ্রীক apo, জর্মান ab এবং ইংরেজি off ইহার স্বজাতীয়। ইহার অর্থ from, নিকট হইতে দূরে। এই দূরীকরণতা হইতে ন্যগ্‌ভাব অর্থাৎ ঘৃণাব্যঞ্জকতাও অপ উপসর্গের একটি অর্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরেজি ভাষাতেও abject abduction aberration abhor শব্দ আলোচনা করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়।

লাটিন sub, গ্রীক hupo যে উপসর্গের স্বজাতীয় ইহা সকলেই জানেন। অব শব্দের নিম্নগতার উপ শব্দের নিম্নবর্তিতার কিঞ্চিৎ অর্থভেদ আছে। উপ উপসর্গে উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটি যোগ রাখিয়া দেয়, অব উপসর্গে সেই সম্বন্ধটি নাই। কূল ও শাখার তুলনায় উপকূল উপশাখা যদিচ নিম্নশ্রেণীয়, তথাপি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নিম্নে বসা মাত্রকেই

উপাসনা বলে না, পরন্তু আর-কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার হয়ে নিজেকে আসীন করাই উপাসনা শব্দের উপপত্তিমূলক ভাবার্থ।

Hyper hupar up super উপসর্গগুলির সহিত সংস্কৃত উৎ উপসর্গের সম্পর্ক শ্রুতিমাত্র হৃদয়ংগম হয় না। কিন্তু উৎ হইতে উপ্; উধ হইতে উভ শব্দের উদ্ভব শব্দশাস্ত্র-মতে সংগত। প্রাচীন বাংলার উভমুখ, উভকর, উভরায় শব্দ তাহার প্রমাণ। পালিতেও ঊর্ধ্বম্ অব্যয়শব্দ উব্ভম হইয়াছে। উৎছলিত হওয়াকে বাংলায় উপছিয়া পড়া কহে। উৎপাটিত করাকে উপড়াইয়া ফেলা বলে।
সম উপসর্গ যে গ্রীক syn এবং লাটিন con উপসর্গের একজাতীয় এবং একত্রীভবনের ভাবই তাহার মূল অর্থ, এ সম্বন্ধেও আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা করি না। খণ্ডিত হওয়ার ভাব হইতে বি উপসর্গে যেরূপ বিকৃতি অর্থ আসিয়াছে, একত্রিত হওয়ার ভাব হইতে সং উপসর্গে ঠিক তাহার উল্টা অর্থ প্রকাশ করে। ফলত সং এবং বি পরস্পর বৈপরীত্যবাচক উপসর্গ। সং এক এবং বি দুই। চেম্বার্সের অভিধানে syn উপসর্গ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—The root originally signifying one is seen in L, simmul, together simple। শব্দের উৎপত্তিনির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে—Simplus, sim once, plico to fold। বিখ্যাত ঋক্ মন্ত্রে সংগচ্ছদ্ধং সংবদদ্ধং শ্লোকে স্পষ্টতই সং শব্দের একত্ব অর্থ প্রকাশ পায়; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন আর্যভাষায় সং শব্দের কোনো মূল ধাতুর অর্থ যে এক ছিল, সে অনুমান অন্যায় নহে।

যাহা হউক, অভিধানে উপসর্গগুলির যে-সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা না হইলেও, তাহারা যে মূল অর্থ নহে এবং বিচিত্র আর্যভাষার তুলনা করিয়া যে মূল অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করা যাইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বহুল পরিমাণে তুলনামূলক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি। ফলত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অবহেলাসহকারে ‘উপসর্গের অর্থবিচার’ প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে।

প্রাকৃত ও সংস্কৃত

শ্রীনাথবাবু তাঁহার ‘ভাষাতত্ত্ব’-সমালোচনার প্রতিবাদে১ প্রাচীন বাংলাসাহিত্য হইতে যে-সকল উদাহরণ২ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে, জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা ‘প্রাকৃত’ নামে অভিহিত হইত। মারাঠি ভাষায় এখনো প্রাকৃত শব্দের সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু প্রাকৃত শব্দের এই প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় চলে নাই, চলা প্রার্থনীয় কি না সন্দেহ।

পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা, সাধারণকথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন যাহা প্রাকৃত ছিল তাহাই বিশেষরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।

এখনো বাংলায় লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যদি ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণকথিত বাংলাকে প্রাকৃত বলি, তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাংলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুত এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইহাই। কিন্তু এরূপ হইলে বিপাকে পড়িতে হইবে।

কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নাটকে যে-প্রাকৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সময়ের চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষা প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, অথচ সাহিত্যের প্রাকৃত একই এবং সে-প্রাকৃতের এক ব্যাকরণ। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় হয় না যে, বিশেষ সময়ের ও বিশেষ দেশের চলিত ভাষা অভিধানে প্রাকৃত শব্দে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া গেছে; অন্য দেশকালের প্রাকৃতকে ‘প্রাকৃত’ বলিতে গেলে কেঁচোকেও উদ্ভিদ বলা যাইতে পারে।

যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলাশব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়, যদি লিখিত বাংলাকে ‘সংস্কৃত বাংলা’ ও কথিত বাংলাকে ‘প্রাকৃত বাংলা’ বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাকৃত ভাষা অন্যরূপ। প্রাকৃত ভাষা বাংলাভাষা নহে, বররুচি তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

বাংলা ব্যাকরণ

তর্কের বিষয়টা কী, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয়; অবশেষে খুনাখুনি রক্তপাতের পর হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, দুই পক্ষের মধ্যে মতের বিশেষ অনৈক্য নাই। অতএব ঝগড়াটা কোন্‌খানে, সেইটে আবিষ্কার করা একটা মস্ত কাজ।

আমি কতকগুলা বাংলাপ্রত্যয় ও তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা বিচারের জন্য ‘পরিষৎ’-সভার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।৩ আমার সে-লেখাটা এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হয় নাই, সুতরাং আমার তরফের বক্তব্য পাঠকের সম্মুখে অনুপস্থিত। শুনিয়াছি, কোন্ সুযোগে তাহার প্রুফটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কোন্ কাগজে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইয়া গেছে।৪ আমার সাক্ষী হাজির নাই, এই অবকাশে বাদের পূর্বেই প্রতিবাদকে পাঠকসভায় উপস্থিত করিয়া একতরফা মীমাংসার চেষ্টা করাকে ঠিক ধর্মযুদ্ধ বলে না।

১ শ্রীনাথ সেন প্রণীত ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩০৮) গ্রন্থকার-বৃত প্রতিবাদ (আলোচনা গ : বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮)।

২ দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, বর্তমান খন্ড।

৩ দ্রষ্টব্য “বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত”, পৃ. ৩৮২

৪ নূতন বাংলা ব্যাকরণ— শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী : ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৮

এখন সে লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা।

বাংলায় জল হইতে জোলো, মদ হইতে মোদো, পানি হইতে পানতা, নুন হইতে নোনতা, বাঁদর হইতে বাঁদ্‌রাম, জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির জন্য যে অল্প একটুখানি বেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধারণের কাছে মনে মনে দাবি করিয়াছিলাম, তাহা নামঞ্জুর হইয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করিতাম না। সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিক্ষায় কাজ নাই, এখন কুত্তা বুলাইয়া লইলে বাঁচি।

এখন আমার নামে উলটা অভিযোগ আসিয়াছে যে, আমি এই চলিত কথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলাভাষাটাকেই মাটি করিবার চেষ্টায় আছি।

যে-কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর-কাহারও সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারও কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে. তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিত কথাগুলি এবং সংস্কৃত-ব্যাকরণনিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখমাত্র করিলেই বাংলাভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন ধারণা কেন হয়। হিন্দুঘরে গ্রাম্য আত্মীয়ের, দরিদ্র আত্মীয়েরও তো প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো জবাব দেয়, উহারা আত্মীয় বটে কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে।

বাংলায় যাহা-কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতে নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃতনিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলা-নিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলাভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, ‘পাগলাম’ এবং ‘সাহেবিয়ানা’ কথা যে বাংলায় আছে, ও ‘আম’ এবং ‘আনা’ নামক সংস্কৃতের প্রত্যয় দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যায়—এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন ‘উন্মত্ততা’ ও ‘ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব’ কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্য কথা দুটার অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান। সংস্কৃত ভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন

না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি ‘ধোপাকে কাপড় দিলাম’ কর্ম এবং ‘গরিবকে কাপড় দিলাম’ সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে ‘বালক’, দ্বিবচনে ‘বালকেরা’ ও বহুবচনেও ‘বালকেরা’ না হইবে কেন। তবে বাংলাক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়—একবচন ‘হইল’, দ্বিবচন ‘হইল’, বহুবচন ‘হইল’; একবচন ‘দিয়াছে’, দ্বিবচন ‘দিয়াছে’, বহুবচন ‘দিয়াছে’ ইত্যাদি। ‘তাহাকে দিলাম’ যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে, তবে ‘তাহাকে মারিলাম’ সন্তাড়ন-কারক; ‘ছেলেকে কোলে লইলাম’ সংলালন-কারক; ‘সন্দেশ খাইলাম’ সম্ভোজন-কারক; ‘মাথা নাড়িলাম’ সঞ্চালন-কারক এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর; এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত কর্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্ভূত। ‘করিল’ ক্রিয়াপদ ‘কৃত’ হইতে, ‘করিব করিবে’ ‘কর্তব্য’ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে; হ্যর্ন্ লে-সাহেব তাঁহার তুলনামুলক গৌড়ীয় ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কতৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাগ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি ‘এন’ বাংলায় ‘এ’ হইয়াছে; যেমন, বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে, চোখে দেখিতে পাই না ইত্যাদি। বাঘে খাইল, কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জমা ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ। কিন্তু খাদিত শব্দ বাংলায় খাইল আকার ধারণ করিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল; সুতরাং বাঘ যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য, ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ, বাংলায় হইল বাঘে রামকে খাইল; বাঘে শব্দে করণকারকের এ-কার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাম শব্দে কর্মকারকের কে বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। পণ্ডিতমশায় বলিতে পারেন, হ্যর্ন্‌ালে সাহেব-টাহেব আমি মানি না, বাংলায় এ-কার বিভক্তি কর্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক, তেমন করিয়া মেলানো যায় কি না। ধনে শ্যামকে বশ করা গেছে, ইহার সংস্কৃত অনুবাদ ধনেন শ্যামো বশীকৃতঃ। কিন্তু বাংলাবাক্যটির কর্তা কে। ‘ধনে’ যদি

কর্তা হইত, তবে ‘করা গেছে’ ক্রিয়া ‘করিয়াছে’ রূপ ধরিত। ‘তাঁহাকে’ শব্দ কর্তা নহে, ‘কে’ বিভক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কর্তা উহ্য আছে বলা যায় না; কারণ ‘করা গেছে’ ক্রিয়া কর্তা মানে না, আমরা করা গেছে, তাঁহারা করা গেছে, হয় না। অথচ ভাবার্থ দেখিতে গেলে, ‘বশ করা গেছে’ ক্রিয়ার কর্তা উহ্যভাবে ‘আমরা’। করা গেছে, খাওয়া গেছে, হওয়া গেছে, সর্বত্রই উত্তম পুরুষ। কিন্তু এই ‘আমরা’ কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই, আমরা আয়োজন করা গেছে, বলিতেই পারি না। এইরূপ কর্তৃহীন কবন্ধবাক্য সংস্কৃত ভাষায় হয় না বলিয়া কি পণ্ডিতমশায় বাংলা হইতে ইহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। তাঁহাকে নাচিতে হইবে, কথাটার সংস্কৃত কী। তাং নর্তিতুং ভবিষ্যতি, নহে। যদি বলি, ‘নাচিতে হইবে’ এক কথা, তবু ‘তাং নর্তব্যম্’ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতে যেখানে ‘তয়া নর্তব্যম্’ বাংলায় সেখানে ‘তাহাকে নাচিতে হইবে’। ইহা বাংলা ব্যাকরণ না সংস্কৃত ব্যাকরণ? আমার করা চাই—এই ‘চাই’ ক্রিয়াটা কী। ইহার আকার দেখিতে ইহাকে উত্তমপুরুষ বোধ হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ইহাকে ‘মম করণং যাচে’ বলা চলে না। বাংলাতেও ‘আমি আমার করা চাই’ এমন কখনো বলি না। বস্তুত ‘আমার করা চাই’ যখন বলি, তখন অধিকাংশ সময়েই সেটা আমি চাই না, পেয়াদায় চায়। অতএব এই ‘চাই’ ক্রিয়াটা সংস্কৃত ব্যাকরণের কোন্-জিনিসটার কোন্ সম্বন্ধী। আমাকে তোমার পড়াতে হবে, এখানে ‘তোমার’ সর্বনামটি সংস্কৃত কোন্ নিয়মমতে সম্বন্ধপদ হয়। এই বাক্যের অনুবাদ ত্বং মাং পাঠয়িতুম্ অর্হসি; এখানে ত্বং কর্তৃকারক ও প্রথমা এবং অর্হসি মধ্যমপুরুষ—কিন্তু বাংলায় ‘তোমার’ সম্বন্ধপদ এবং ‘হবে’ প্রথমপুরুষ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে এ-সকল বাক্য সাধা অসাধ্য, বাংলাভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য। পণ্ডিতমশায় কোন্ পথে যাইবেন। ‘আমাকে তোমার পড়াতে হবে’ বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃতনিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে।

অপর পক্ষে বলিতে পারেন, যেখানে সংস্কৃতে বাংলায় যথার্থ প্রভেদ ঘটিয়াছে, সেখানে প্রভেদ মানিতে রাজি আছি, কিন্তু যেখানে প্রভেদ নাই, সেখানে তো ঐক্য স্বীকার করিতে হয়। যেমন সংস্কৃত ভাষায় ইন্ প্রত্যয়যোগে ‘বাস’ হইতে ‘বাসী’ হয়, তেমনই সেই সংস্কৃত ‘ইন্’ প্রত্যয়ের যোগেই বাংলা দাগ হইতে দাগী হয়-বাংলাপ্রত্যয়টাকে কেহ যদি ই প্রত্যয় নাম দেয় তবে সে অন্যায় করে।

আমরা বলিয়াছিলাম বটে যে, চাষি, দামি, দাগি, দোকানি প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয়যোগে নহে, বাংলা ই প্রত্যয়যোগে হইয়াছে। কেন বলিয়াছিলাম বলি। জিজ্ঞাস্য এই যে, বাসী শব্দ যে প্রত্যয়যোগে ঈ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ঈ প্রত্যয় না বলিয়া ইন্ প্রত্যয় কেন বলা হইয়াছে। ইন্ প্রত্যয়ের ন্-টা মাঝে মাঝে 'বাসিন্' 'বাসিনী' রূপে বাহির হইয়া পড়ে বলিয়াই তো? যদি কোথাও কোনো অবস্থাতেই সে ন্ না দেখা যায় তবু কি ইহাকে ইন্ প্রত্যয় বলি। ব্যাঙাচির লেজ ছিল বটে, কিন্তু সে লেজটা খসিয়া গেলেও কি ব্যাঙকে লেজবিশিষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু পণ্ডিতমশায় বলেন, সংস্কৃত মানী শব্দও তো বাংলায় 'মানিন্ ' হয় না। আমাদের বক্তব্য এই যে, কেহ যদি সেইভাবে কোথাও ব্যবহার করেন, তাঁহাকে কেহ একঘরে করিবে না; অন্তত মানী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মানিনী' হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীবিদ্যালয়ের মসীচিহ্নিত বালিকাকে যদি 'দাগিনী' বলা যায়, তবে ছাত্রীও হাঁ করিয়া থাকিবে, তাহার পণ্ডিতও টাকে হাতে বুলাইবেন।

তখন বৈয়াকরণ পণ্ডিতমশায় উলটিয়া বলিবেন, দাগ কথাটা বাংলাকথা, ওটা তো সংস্কৃত নয়, সেইজন্য স্ত্রীলিঙ্গে তাহার ব্যবহার হয় না। ঠিক কথা, যেমন বাংলায় বিশেষণশব্দ স্ত্রীলিঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিয়াছে, তেমনই বাংলায় ইন্ প্রত্যয় তাহার ন্ বর্জন করিয়া ই প্রত্যয় হইয়াছে।

ভালো, একটি সংস্কৃত কথাই বাহির করা যাক। ভার শব্দ সংস্কৃত। তবু আমাদের মতে 'ভারি' কথায় বাংলা ই প্রত্যয় হইয়াছে, সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, 'ভারিণী নৌকা' লিখিতে পণ্ডিতমশায়ের কলমও দ্বিধা করিবে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, মানী কথাটা প্রত্যয় সমেত সংস্কৃতভাষা হইতে পাইয়াছি, ভারি কথাটা পাই নাই; আমাদের প্রয়োজনমত আমরা উহাকে বাংলা প্রত্যয়ের ছাঁচে ঢালিয়া তৈরি করিয়া লইয়াছি। মাস্টার কথা আমরা ইংরেজি হইতে পাইয়াছি, কিন্তু মাস্টারি (মাস্টার-বৃত্তি) কথায় আমরা বাংলা ই প্রত্যয় যোগ করিয়াছি। এই ই ইংরেজি mastery শব্দের y নহে। সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা লিখিবার সময় কেহ যদি 'ভো স্বদেশিন্' লেখেন, তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচক প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কেহ যদি 'ভো বিলাতিন্' লিখিয়া রচনার গাম্ভীর্যসঞ্চার করিতে চান, তবে ঘরে-পরে সকলেই হাসিয়া উঠিবে। কেহ বলিতে পারেন 'বিলাতি' সংস্কৃত ই প্রত্যয়, ইন্ প্রত্যয় নহে। আচ্ছা, দোকান যাহার আছে সেই 'দোকানি'কে সম্ভাষণকালে 'দোকানিন্' এবং তাহার স্ত্রীকে 'দোকানিনী' বলা যায় কি।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাংলায় ‘রাগ’ শব্দের অর্থ ক্রোধ; সেই ‘রাগ’ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয়ে ‘রাগি’ হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর কাল হইতে আজ পর্যন্ত পণ্ডিত অপণ্ডিত কেহই রুষ্টা স্ত্রীলোককে ‘রাগিণী’ বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই।

গোবিন্দদাস রাধিকার বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন :

নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে!

গোবিন্দদাস মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সংগীতের ‘রাগিণী’ কথাটা সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। ‘অনুরাগী’ কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, সে যেমনই হউক, এ-সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন; আমিও সে কথা স্বীকার করি।

প্রমাণ হইয়াছে, একই মূল হইতে ‘হংস’ এবং ইংরেজি ‘গ্যান্ডার’ শব্দ উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া গ্যান্ডার সংস্কৃত হংস শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে ‘গ্যান্ডারী’ না হইয়া ‘গূস্’ হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই আর্যপিতামহ হইতে বপ্ বার্ণুফ্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শাব্দিক ও বাঙালি ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না; অতএব উৎপত্তি এক হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্নপ্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্ প্রত্যয় হইতে বাংলা ই প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তবু তাহা ইন্ প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না; এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন কোঠায় না ফেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের ফলার লোহা হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছুঁচ দিয়া মাটি চষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে।

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দুভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোশাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুললক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই

প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃতশব্দ ক'টা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষরূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলা ব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে, ছাপাখানার কালির ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়।

ইন্ প্রত্যয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে ইনী ও ঈ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' 'ই' পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালি হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে। রয়ের পরে সে আর মূর্ধণ্য ণ গ্রহণ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে কিন্তু জিহ্বাগ্রে করে না)—সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এইজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে। সে যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইত, তবে 'পাঁঠা' হইতে 'পাঁঠি' হইত না, 'বাঘ' হইতে 'বাঘিনী' হইত না। কলু হইতে কলুনি, ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে মুগ্ধবোধের সূত্র টুকরা টুকরা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, ছি ছি ও কথাগুলা অকিঞ্চিৎকর, উহাদের সম্বন্ধে কোনো বাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর এই যে, কমলি নেই ছোড়তা। পণ্ডিতমশায়ও ঘরের মধ্যে কলুর স্ত্রীকে 'কল্বী' অথবা 'তৈলযন্ত্রপরিচালিকা' বলেন না, সে স্থলে আমরা কোন্ ছার! মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তুমি ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব ছাড়িলাম আর কই। একতলাতেই যাহার বাস তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই—নীচেই তো আছি। ঘোটকীর দীর্ঘ ঈতে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে—কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীনভাষা তাহাকে এ অধিকার দেয় নাই।

কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই; তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে। টিপুসুলতানের কোনো বংশধর যদি নিজেকে মৈশুরের রাজা বলেন, তবে তাঁহার পারিষদরা তাহাতে সায় দিতে পারে, কিন্তু রাজত্ব মিলিবে না। হ্রস্ব ই-কে জোর করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব মিলিবে না। যেখানে খাস বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক, মেছনি কথাটার মধ্যে পূর্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স, এবং যফলা কোথায় গেল। ম-এ একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন। ন-টা কোথাকার কে। ওটা কি মৎসজীবিনীর ন। তবে জীবিটা গেল কোথায়। এমন আরো অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে—এই ছ-ই ৎ এবং স-এর ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা ‘বাছা’ শব্দের মধ্যেও আছে। পরিবর্তনপরম্পরায় যফলা লোপ পাইয়া পূর্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে কাল করিয়াছে—অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা পূর্ব ইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। মাছ শব্দের উত্তর বাংলাপ্রত্যয় উয়া যোগ হইয়া ‘মাছুয়া’ হয়, মাছুয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার ‘মেছো’; মেছো শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয় হইয়াছে। এই নি প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলা উচ্চারণের সত্যরক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈ-র স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে যাহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করা বিধি হয়, তবে ‘মৎস্য’ লিখিয়া ‘মাছ’ পড়িলে ক্ষতি নাই। পণ্ডিত বলিবেন, আমরা সংস্কৃত শব্দেও তিন স, দুই ন, য ও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরকে লিখি শুদ্ধ, কিন্তু পড়ি অশুদ্ধ, অতএব ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চারণের সহিত বানানের অনৈক্য বাংলাতেও চালানো যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, অনেক বাঙালি ইংরাজি w বর্ণের উচ্চারণ করেন না—তাঁহারা লেখেন wood, কিন্তু উচ্চারণ করেন ood; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের উচ্চারণদোষের অনুরূপ বানান করিবার অধিকার তাঁহার নাই; ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে; ইহার বানানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থবোধই হইবে না। কিন্তু, আলমারি শব্দ ‘আলমাইরা’

হইতে উৎপন্ন হইলেও, ইহা জন্মান্তরগ্রহণকালে বাঙালি হইয়া গেছে; সুতরাং বাংলা আলমারি-কে ‘আলমাইরা’ লিখিলে চলিবে না। সহস্র পারসি কথা বিকৃত হইয়া বাংলা হইয়া গেছে, এখন তাহাদের আর জাতে তোলা চলে না; আমরা লোকসান-কে ‘নুক্‌সান্‌’ লিখিলে ভুল হইবে, এমন-কি, লুকসান-ও লিখিতে পারি না। কিন্তু যে পারসি শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, অথচ আমাদের রসনার অভ্যাসবশত যাহার উচ্চারণের কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহার বানান বিশুদ্ধ আদর্শের অনুরূপ লেখা উচিত। অনেক হিন্দুস্থানি নাইয়ের নীচে ধুতি পরে; আমরা তাহাদের কথা জানি, প্রথা জানি, সুতরাং আশ্চর্য হই না—কিন্তু সে যদি নাইয়ের নীচে প্যাণ্টলুন্‌ পরে, তবে তাহাকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিয়া দিতে হয়। নিজের জিনিস নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়, পরের জিনিসে নিজের নিয়ম খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে-সংস্কৃতশব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে—এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।

কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা জড়-এর জ এবং যখন-এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদারকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলাগদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়া লেখা চলিত—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ-কে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতো হইল; তাহার-

আধভালে শুদ্ধ অন্তস্থ সাজে
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁটি বাংলাশব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের রচনাপঙ্‌ক্তির মধ্যে পারতপক্ষে স্থান দেন নাই—কেবল যে-সকল ক্রিয়া ও অব্যয় পদ নহিলে নয়, সেইগুলাকে সংস্কৃত বানানের দ্বারা যথাসাধ্য শোধন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ খাস বাংলাকথা সম্বন্ধে এখনো আমাদের অভ্যাস খারাপ হয় নাই; সেগুলার খাঁটি বাংলা বানান চালাইবার সময় এখনো আছে।

আমরা এ কথা বলিয়া থাকি, সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত বলে, বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলা যায় না। ইহাতে যিনি, সংস্কৃত ব্যাকরণের অপমান বোধ করেন, তিনি বলেন, কেন ণিজন্ত বলিব না, অবশ্য বলিব। কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের দুইটি লাইন মনে পড়ে :

কেন গাহিব না অবশ্য গাহিব,
গাহে না কি কেহ সুস্বর বিহনে।

ণিজন্ত শব্দ সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহাশয়ের সেইরূপ অটল জেদ, তিনি বলেন, ণিজন্ত-

কেন বলিব না অবশ্য বলিব
বলে না কি কেহ কারণ বিহনে

আমরা ব্যাকরণে পণ্ডিত নই, তবু আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে ণিচ্ একটা সংকেত মাত্র—যেখানে সে-সংকেত খাটে না, সেখানে তাহার কোনোই অর্থ নাই। ণিচ্-এর সংকেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ঐ কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের খেতে লাঙল চলিবে কেন, নিশ্চয়ই দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড় জিনিস অত্যন্ত দামি উৎকৃষ্ট জিনিস হইলেও তবু চলিবে না। শ্রু ধাতু যে-নিয়মে 'শ্রাবি' হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর 'শু' 'শৌ' হইয়া ও পরে ইকার যোগে 'শৌনিতেছে' হইত। হয়তো খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃত পঠ্ ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়্ ধাতু হইতে 'পড়ান' হয় 'পাড়ন' হয় না। অতএব সেখানে তাহার সংকেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্- সিগ্নালার তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর একটি যে-সংকেত বসিয়া আছে, সে হয়তো তাহারই শ্রীমান পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে-কৌলিক সাদৃশ্য তো কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তবু যদি বাংলায় সেই ণিচ্ প্রত্যয়ই আছে বলিতে হয়, তবে ধ্রুপদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কাওয়ালিকে চৌতাল নাম দিলেও দোষ হয় না। প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে:

যে সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব মাধুর্য ওজন করা ব্যাকরণকারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে-ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক বা না-করুক, তিনি উদাসীন। কাহারো প্রতি তাঁহার কোনো আদেশ নাই, অনুশাসন নাই। জীবতত্ত্ববিৎ কুকুরের বিষয়ও লেখেন, শেয়ালের বিষয়ও লেখেন। কোনো পণ্ডিত যদি তাঁহাকে

ভর্ৎসনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শিয়ালের কথাটা এত আনুপূর্বিক লিখিতে বসিয়াছ, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুষিতে আরম্ভ করে!—তবে জীবতত্ত্ববিদ্ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া তাঁহার শেয়াল সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করিতেই প্রবৃত্ত হন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক যদি তাঁহার কাগজে মাছের তেলের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন, তবে আশা করি কোনো পণ্ডিত তাঁহাকে এ অপবাদ দিবেন না যে, তিনি মাছের তেল মাথায় মাখিবার জন্য পাঠকদিগকে অন্যায় উত্তেজিত করিতেছেন।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন :

যদি কেহ লেখেন, 'যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন—প্রিয়ে, তুমি যে-কথা বলিতেছ তাহার বিস্‌মোল্লায়ই গলদ' তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অতিশোভন হইবে।

প্রয়োগের শোভনতাবিচার ব্যাকরণের কাজ নহে, অলংকারশাস্ত্রের কাজ—ইহা পণ্ডিতমহাশয় জানেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের সাহস হয় না। উল্লিখিত প্রয়োগে ব্যাকরণের কোনো ভুলই নাই, অলংকারের দোষ আছে। 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' কথাটা এমন জায়গাতেও বসিতে পারে যেখানে অলংকারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে। অতএব পণ্ডিতমশায়ের রসিকতা এখানে বাজে খরচ হইল। যাঁহারা প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাঁহার এই হাস্যবাণে বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবেন না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতমহাশয় এ কথাও মনে রাখিবেন যে, চলিত ভাষা অস্থানে বসাইলেই যে কেবল ভাষার প্রয়োগদোষ হয়, তাহা নহে; বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃতনিয়মে বাংলায় বসাইলেও অলংকারদোষ ঘটিতে পারে। কেহ যদি বলেন, আপনার সুন্দরী বক্তৃতা শুনিয়া অদ্যকার সভা আপ্যায়িতা হইয়াছে, তবে তাহাতে স্বর্গীয় বোপদেবের কোনো আপত্তি থাকিবার কথা নাই, কিন্তু শ্রোতারা গাম্ভীর্য রক্ষা না করিতেও পারেন।

খাঁটি বাংলাকথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা—উট কথাটাকে কোনোমতেই স্ত্রীলিঙ্গে 'উটী' করা যাইবে না, অথবা দাগ শব্দের উত্তর কোনোমতেই ইত প্রত্যয় করিয়া 'দাগিত' হইবে না, ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন। কিন্তু সংস্কৃতশব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দরী' বলিতে পারি, আবার 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর' ইহাও বলা চলে। আমাদের পণ্ডিতমশায় এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিদ্যা যশের হেতুরূপে প্রতীয়মান হয়।' প্রতীয়মান কথাটা তিনি বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যদি সংস্কৃতনিয়মে 'প্রতীয়মানা' লিখিতেন তাহাও চলিত। আর এক

জায়গায় লিখিয়াছেন, ‘বিভীষিকাময়ী ছায়াটাকে বঙ্গভাষার অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন’—ছায়া শব্দের এক বিশেষণ ‘বিভীষিকাময়ী’ সংস্কৃত বিধানে হইল, অন্য বিশেষণ ‘নিষ্কাশিত’ বাংলানিয়মেই হইল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতশব্দ বাংলাভাষায় সুবিধামত কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলানিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলাকথার সে-স্বাধীনতা নাই—’কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে’ এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু ‘কথাটা ঠিক হইয়াছে’ না বলিয়া যদি ‘ঠিকা হইয়াছে’ বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলারচনায় সংস্কৃতশব্দ কোথায় বাংলানিয়মে, কোথায় সংস্কৃতনিয়মে চলিবে তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলংকারশাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলাশব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ—সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে; এইজন্যই, ‘ভ্রাতৃবধূ একাকী আছেন’ অথবা ‘একাকিনী আছেন’ দু-ই বলিতে পারি—কিন্তু ‘আমার ভাজ একলা আছেন’ না বলিয়া ‘এক্‌লানী আছেন’ এমন প্রয়োগ প্রাণান্ত সংকটে পড়িলেও করা যায় না। অতএব, বাংলাভাষায় সস্কৃতশব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা-বৈয়াকরণের সে-যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই।

আমার প্রবন্ধে আমি ইংরেজি monosyllabic অর্থে ‘একমাত্রিক’ কথা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং ‘দেখ্‌, মার্‌’ প্রভৃতি ধাতুকে একমাত্রিক বলিয়াছিলাম, ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে হ্রস্বস্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, প্লুতস্বরের তিনমাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা গণনা করা হয়।

অতএব তাঁহার মতে দেখ্‌ ধাতু আড়াইমাত্রিক। এই যুক্তি অনুসারে ‘একমাত্রিক’ শব্দটাকে তিনি বিদেশী বলিয়া গণ্য করেন।

ইহাকেই বলে বিস্‌্‌মোল্লায় গলদ। মাত্রা ইংরেজিই কী বাংলাই কী আর সংস্কৃতই কী। যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো ছিল, তবু ‘এক’ তখনো ‘এক’ই ছিল এবং দুই ছিল ‘দুই’। পণ্ডিতমশায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়া দেখেন, তবে হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গণিতশাস্ত্রের এক ইংলণ্ডেও এক, বাংলাদেশেও এক এবং ভীষ্ম-দ্রোণ ভীমার্জুনের নিকটও তাহা একই ছিল।

তবে আমরা যেখানে এক ব্যবহার করি অন্যত্র সেখানে দুই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন, আমরা এক হাতে খাই, ইংরেজ দুই হাতে খায়, লঙ্কেশ্বর রাবণ হয়তো দশ হাতে খাইতেন; আমরা কেবল আমাদেরই খাওয়ার নিয়মকে স্মরণ করিয়া ঐ-সকল ‘বাহুহাস্তিক’ খাওয়াকে ‘ঐকহাস্তিক’ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষায় যে-শব্দ আড়াইমাত্রা কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইত, বাংলায় সেটা যদি একমাত্রা কাল লইয়া উচ্চারিত হয় তবুও তাহাকে আড়াইমাত্রিক বলিবই—সংস্কৃত ব্যাকরণের খাতিরে বুদ্ধির প্রতি এতটা জুলুম সহ্য হয় না। পণ্ডিতমহাশয়কে যদি নামতা পড়িতে হয়, তবে সাতসাত্তে উনপঞ্চাশ কথাটা তিনি কতক্ষণ ধরিয়া উচ্চারণ করেন? বাংলা ব্যবহারে ইহার মাত্রা ছয়—সংস্কৃতমতে ষোলো। তিনি যদি পাণিনির প্রতি সম্মান রাখিবার জন্য ষোলো মাত্রায় সা-ত-সা-ত্তে-উ-ন-প-ঞ্চা-শ উচ্চারণ করিতেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা নির্বোধ ছেলে দ্রুত আওড়াইয়া দিয়া ক্লাসে তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইত। সংস্কৃত ব্যাকরণকেই যদি মানিতে হয়, তবে কেবল মাত্রায় কেন উচ্চারণেও মানিতে হয়। পণ্ডিতমহাশয়ের যদি লক্ষ্মীনারান বলিয়া চাকর থাকে এবং তিনি অষ্টাধ্যায়ীর মতে দীর্ঘ-হ্রস্ব-প্লুত স্বরের মাত্রা ও কণ্ঠ-তালব্য-মূর্ধন্যের নিয়ম রাখিয়া ‘লক্‌ষমীনারায়ড়ঁ’ বলিয়া ডাক পাড়েন তবে একা লক্ষ্মীনারান কেন, রাস্তার লোক সুদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাজেই বাংলা ‘ক্ষ’ সংস্কৃত ক্ষ নহে এবং বাংলার মাত্রা সংস্কৃতের মাত্রা নহে। এ কথা বাংলা ব্যাকরণকার প্রচার করা কর্তব্য বোধ করেন। এইজন্য স্বয়ং মাতা সরস্বতীও যখন বাংলা বলেন, বাঙালীর ছেলেরা তাহা নিজের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিতে পারে—তবে তাঁহারই বরপুত্র হইয়া পণ্ডিতমহাশয় বাংলাভাষার বাংলানিয়মের প্রতি এত অসহিষ্ণু কেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আর-কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত করিবেন না, কেবল ‘একমাত্রিক শব্দের দেশীয় ব্যাকরণ ও অভিধানানুযায়ী অর্থ গ্রহণ’ করিবেন। তাই করুন, আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে, অর্থ জিনিসটাকে গ্রহণ করিব বলিলেই করা যায় না। অভিধানব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্ধুক—তাহারা অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পারে মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন :

রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছে ‘থ্যাঁলো মাংস’—এই থ্যাঁলোটা কী।

অবশেষে শান্ত, বিমর্ষ, হতাশ হইয়া লিখিতেছেন :

অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্বিশেষে মৎস্যমাংসের গতিবিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি, তাহাতেও কোনো ফল হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রবন্ধ বহন করিয়া আজ পর্যন্ত পরিষৎ-পত্রিকা বাহির হয় নাই, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার পাঠ শুনিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন। অতএব, যখন আমি ‘থ্যাঁৎলা’ বলিয়াছিলাম, তখন যদি বক্তার দূরদৃষ্টক্রমে শ্রোতা থ্যাঁলো-ই শুনিয়া থাকেন, তবে সেজন্য বক্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দুষ্কৃতিকারীকে তৎক্ষণাৎ শাসন না করিয়া যে-সকল নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ লোক কলিকাতায় বাস করেন অথচ সাহিত্যচর্চা করেন এবং মৎস্য মাংস খাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে খামকা জবাবদিহিতে ফেলিলেন কেন। প্রতিবাদী মহাশয় যদি কোনো সুযোগে পরিষৎ-পত্রিকার প্রুফ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল দেখিয়া থাকেন তবে সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ছাপার ভুলে যদি দণ্ডিত হইতে হয়, তবে দণ্ডশালায় পণ্ডিতমহাশয়েরও সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এরূপ ছোটো ছোটো ভুল খুঁটিয়া মূল প্রবন্ধের বিচার সংগত নহে। থ্যাঁলো শব্দটা রাখিলে বা বাদ দিলে আসল কথাটার কিছুই আসে যায় না।বাংলা আল্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমক্রমে যদি ‘বাচাল’ সংস্কৃত কথাটা বসিয়া থাকে তবে সেটাকে অনায়াসে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের মূলে আঘাত করে না। ‘ছাগল’ যদি সংস্কৃত শব্দ হয়, তবে তাহাকে বাংলা ল প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগণ্ডি হইতে বিনা ক্লেশে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, খাঁটি বাংলা দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। ধানের খেতের মধ্যে যদি দুটো-একটা গত বৎসরের যবের শীষ উঠিয়া থাকে, তাহাকে রাখ বা ফেলিয়া দাও, বিশেষ আসে যায় না, তাই বলিয়াই ধানের খেতকে যবের খেত বলা চলে না।

মোট কথাটার এবং আসল কথাটার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অণুবীক্ষণ হাতে ছোটো ছোটো খুঁত ধরিবার চেষ্টায় বেড়াইলে খুঁত সর্বত্রই পাওয়া যায়। যে-গাছ হইতে ফল পাড়া যাইতে পারে, সে-গাছ হইতে কীটও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই কীটের দ্বারা গাছের বিচার করা যায় না।

একটি গল্প মনে পড়িল। কোনো রাজপুত গোঁফে চাড়া দিয়া রাস্তায় চলিয়াছিল। একজন পাঠান আসিয়া বলিল, লড়াই করো। রাজপুত বলিল, খামকা লড়াই করিতে আসিলে, ঘরে কি স্ত্রী পুত্র নাই। পাঠান বলিল, আছে বটে, আচ্ছা তাহাদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিগে। বলিয়া বাড়ি গিয়া সব কটাকে কাটিয়াকুটিয়া নিঃশেষ করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুত জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি যে লড়াই করিতে বলিতেছ, আমার অপরাধটা কী। পাঠান বলিল, তুমি যে আমার সামনে গোঁফ তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ। রাজপুত তৎক্ষণাৎ গোঁফ নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই, গোঁফ নামাইয়া দিতেছি।

প্রতিবাদী মহাশয়ের কাছে আমারও প্রশ্ন এই যে, ঐ 'ছাগল' 'বাচাল' 'থ্যাঁৎলা' এবং 'নৈমিত্তিক' শব্দ কয়েকটি লইয়াই কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ। আচ্ছা আমি গোঁফ নামাইয়া লইতেছি—ও শব্দ কয়টা একেবারেই ত্যাগ করিলাম। তাহাতে মূল প্রবন্ধের কোনোই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ইহাতে বিবাদ মিটিবে কি। প্রতিবাদী বলিবেন, অকিঞ্চিৎকর কথাগুলো বাংলায় ঢোকাইয়া তুমি ভাষাটাকে মাটি করিবার চেষ্টায় আছ। আমার বিনীত উত্তর এই যে, ঐ কথাগুলো আমার এবং তাঁহার বহুপূর্ব পিতামহ-পিতামহীরা প্রচলিত করিয়া গেছেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে।

প্রতিবাদী মহাশয়ের হুকুম হইতে পারে, আচ্ছা বেশ, ভাষায় আছে থাক্, তুমি ওগুলার নিয়ম আলোচনা করিয়ো না। কিন্তু এ হুকুম চলিবে না। গোঁফের এই ডগাটুকু নামাইতে পারিব না।

যে-কথাগুলি লইয়া আজ এত তর্ক উঠিল তাহা এতই সোজা যে, পাঠক ও শ্রোতাদের এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-সভা'র সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেক্সপীয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই খাটে। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য একা আসে না, দলবল সঙ্গে করিয়াই আসে। প্রতিবাদী মহাশয়ও একা নহেন, তাঁহার দলবল আছে। তিনি শাসাইয়াছেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বি. এ. এম. এ. উপাধিধারী' এবং 'বর্তমান সময়ে যে-সকল লেখক ও লেখিকা গ্রনথ প্রণয়ন করিতেছেন' তাঁহারা এবং

'ইংলন্ডপ্রত্যাগত অনেক কৃতবিদ্য' তাঁহার দলে আছেন।—ইহাতে অকস্মাৎ বাংলাভাষার এত হিতৈষী অভিভাবকের ভিড় দেখিয়া এতকালের উপেক্ষিতা মাতৃভাষার জন্য আশাও জন্মে অথচ নিজের অসহায়তায় হৃৎকম্পও উপস্থিত হয়। সেই কারণে পণ্ডিতমহাশয়ের দল ভাঙাইয়া লইবার জন্যই আমার আজিকার এই চেষ্টা। তাঁহাদিগকে আমি আশ্বাস দিতেছি, এ দলে আসিয়াও তাঁহারা 'ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য রক্ষায়' মনোযোগ করিলে আমরা কেহ বাধা বাধা দিব না, চাই কি, আমরাও শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

কেবল তাঁহাদিগকে এ অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা ভাষাবাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কৃতবিদ্যতা ও ইংলন্ডপ্রত্যাগমনের গৌরব ক্ষুণ্ন হইবে না, অথচ আমিও যথেষ্ট সম্মানিত ও সহায়বান হইব।

বিবিধ

সাময়িক সাহিত্য

পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহুমূল্যবান। ...সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃতবানানকে বাংলাবানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলাবানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলাবানান, এমন-কি, বাংলাপদবিন্যাসপ্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে যে দু-একটি পারিভাষিক শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলায় এভোল্যুশন্ থিওরি-র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখকমহাশয় তাহার মধ্যে হইতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট; এবং শব্দটিকে অভিব্যক্ত বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তা ছাড়া ব্যক্ত হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালোমন্দ উন্নতি-অবনতির কোনো বিচার নাই; বিকাশ শব্দের মধ্যে একটি উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখকমহাশয় Natural Selection -কে বাংলায় নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন। এই সিলেক্‌শন্ শব্দের চলিত বাংলা ‘বাছাই করা’। বাছাই কার্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে; বলিতে পারি চা-বাছাই করিবার যন্ত্র, কিন্তু চা-মনোনীত করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। মন শব্দের সম্পর্কে মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছাঅভিরুচির ভাব আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক সিলেক্‌শন্ যন্ত্রবৎ নিয়মের কার্য, তাহার মধ্যে

ইচ্ছার অভাবনীয় লীলা নাই। অতএব বাছাই শব্দ এখানে সংগত। বাংলায় বাছাই শব্দের ধাতু প্রয়োগ নির্বাচন। 'নৈসর্গিক নির্বাচন' শব্দে কোনো আপত্তির কারণ আছে কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। Fossil শব্দকে সংক্ষেপে 'শিলাবিকার' বলিলে কিরূপ হয়? Fossilized শব্দকে বাংলায় শিলাবিকৃত অথবা শিলীভূত বলা যাইতে পারে।

লেখকমহাশয় ইংরেজি ফসিল্ শব্দের বাংলা করিয়াছেন 'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল'। কিন্তু উদ্ভিদ পদার্থের ফসিল্ সম্বন্ধে কঙ্কাল শব্দের প্রয়োগ কেমন করিয়া হইবে। 'পাতার কঙ্কাল' ঠিক বাংলা হয় না। ফসিলের প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, 'শিলাবিকার' metamorphosed rock-এর উপযুক্ত ভাষান্তর হয়, এবং জীবশিলা শব্দ ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

'চরিত্রনীতি' প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইংরেজি Ethics শব্দকে তিনি বাংলায় চরিত্রনীতি নাম দিয়াছেন। অনেকে ইহাকে নীতি ও নীতিশাস্ত্র বলেন—সেটাকে লেখক পরিত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছেন; কারণ নীতি শব্দের অর্থ সকল সময়ে ধর্মানুকুল নহে।

প্রহরিস্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্।
অপিচাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো।

ইহাও এক শ্রেণীর নীতি, কিন্তু এথিক্স্ নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে মুখ্যত এথিক্স্ বুঝায়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে আরো অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌনী হইয়া ভোজন করিবে, ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম হইতে পারে কিন্তু ইহা এথিক্স্ নহে। অতএব চরিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর-একটু সংহত করিয়া 'চারিত্র' বলিলে ব্যবহার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। চরিত্রনীতিশিক্ষা, চরিত্রনীতিবোধ, চরিত্রনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা 'চারিত্রশিক্ষা', 'চারিত্রবোধ', 'চারিত্রোন্নতি' আমাদের কাছে সংগত বোধ হয়। ... আর-একটি কথা জিজ্ঞাস্য, metaphysics শব্দের বাংলা কি 'তত্ত্ববিদ্যা' নহে।

লেখক মহাশয় সেন্‌ট্রিপীটাল্‌ ও সেন্‌ট্রিফ্যুগাল ফোর্স-কে কেন্দ্রাভিসারিনী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি বলিয়াছেন—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি আমাদের মতে সংক্ষিপ্ত ও সংগত।

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য কিন্তু বিবাদ করা অসংগত। ইংরেজি মিটিয়রলজির বাংলা প্রতিশব্দ এখনো প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং জগদানন্দবাবু যদি আপ্তের সংস্কৃত অভিধানের দৃষ্টান্তে ‘বায়ুনভোবিদ্যা’ ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যোগেশবাবু ‘আবহ’ শব্দ কোনো প্রাচীন গ্রনথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কী বুঝিতেন এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে—এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে মর্তে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন আমরা কোন বায়ুর অধিকারে আসিয়াছি।” মাতলি উত্তর করিলেন, “গগনবর্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহবায়ুর মার্গ।” দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে ‘প্রবহ’ প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায় :

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্‌বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ॥

এই-সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নির্বিচারে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃ শব্দ পারিভাষিক নহে, তাহার অর্থ আকাশ, এবং সে-আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সেইজন্য নভঃ ও নভস্য শব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস বুঝায়। কিন্তু নভঃ শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ুশব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি। আপ্তেও তাঁহার অভিধানে তাহা করেন নাই; তাঁহার আভিধানিক

সংকেত অনুসারে নভোবায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা বায়ুবিদ্যা বুঝাইতেছে। ‘নভোবিদ্যা’ মিটিয়রলজির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা ভাঙা ভাঙা আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙ্গা-অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গা শব্দের সহিত ঢ্যাঙা তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে-নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদ-কে চান্দ, পাঁক-কে পঙ্ক, কুমার-কে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনা-কে সোণা, কান-কে কাণ বানান করেন, অথচ শ্রবণশব্দজ শোনা-কে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই। পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় বাংলা বানানের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

টেক্‌সট্‌বুক্‌ কমিটি ক্ষকারকে বাংলা বর্ণমালা হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখাইয়া ক্ষকারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ কেমন করিয়া প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সে-সময়ে দ্বাররক্ষক যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ খ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ক্ষকারে মূর্ধন্য ষ-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ছিল না। না থাকিলেও উহা যুক্ত অক্ষর এবং উহার উচ্চারণ ক্‌খ। শব্দের আরম্ভে অনেক যুক্ত অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণ থাকে না, যেমন জ্ঞান শব্দের ‘; কিন্তু অজ্ঞ শব্দে উহার যুক্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ক্ষকারও সেই রূপ—ক্ষয় এবং অক্ষয় শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ হইবে। অতএব অসংযুক্ত বর্ণমালায় ক্ষকার দলভ্রষ্ট একঘরে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্যঞ্জনপঙ্‌ক্তির মধ্যে উহার অনুরূপ সংকরবর্ণ আর-একটিও নাই। দীর্ঘকালের দখল প্রমাণ হইলেও তাহাকে আরো দীর্ঘকাল অন্যায় অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত কি।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ‘জাতীয় সাহিত্য’ প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমত চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে

না। তিনি বলেন, “কেন চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।” আমরা বলি, কেহ তো জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করিতেছে না, স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নবদ্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল; কিন্তু নিশ্চয় কাব্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া সেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক-একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরেজি ভাষা লাটিননিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত, তবে এ ভাষা এত প্রবল, এত বিচিত্র, এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনারুপার মতো জড়পদার্থ নহে যে, তাহাকে ছাঁচে ঢালিব। তাহা সজীব—তাহা নিজের অনির্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাত করিয়া দেয়; তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে। লোককে না মারিলে ফেলিলে লোকাচারের নিত্য-পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়ো। সেইজন্যই আমরা ‘ক্ষান্ত’ দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেইজন্যই ব্যাকরণ যেখানে ‘আবশ্যকতা’ ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে ‘আবশ্যক’ ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।

একটা ছোটো কথা বলিয়া লই। ‘অনুবাদিত’ কথাটা বাংলায় চলিয়া গেছে—আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা সৃজন কথার জায়গায় ‘সর্জন’ চালাইয়া বসেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গদর্শন-সম্পাদক ‘শব্দদ্বৈত’ নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ফাল্গুনমাসের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সেই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধলেখকের নিকট এই আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গেলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে। কেবল একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের

আভাসমাত্র দিব। —আমরা বলিয়াছিলাম, ‘চার চার’ ‘তিন তিন’ প্রকর্ষবাচক। অর্থাৎ যখন বলি ‘চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির’ তখন একেবারে চার পেয়াদা আসায় বাহুল্যজনিত বিস্ময় প্রকাশ করি। প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব বিভক্ত-বহুলতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ যখন বলা হয়, ‘তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চার চার জন পেয়াদা আসিয়া হাজির’ তখন, সমালোচক মহাশয়ের মতে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত ইহাই বুঝায়। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। বিহারীবাবুও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, একজনের জন্যও ‘চার চার পেয়াদা’ বাংলাভাষা অনুসারে আসিতে পারে। বিহারীবাবু বলেন, দৃষ্টান্ত অনুসারে দুই অর্থই সংগত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিভক্ত-বহুলতা, দুইই বুঝাইতে পারে। তাহা ঠিক নহে—প্রকর্ষই বুঝায়, সেই প্রকর্ষ একজনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে; সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে প্রকর্ষ ভাবই সাধারণ।

প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে-প্রথা কোনো-একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা

অ

অর্শে (যথা, অর্শে— দোষ বর্তে)।

আ

আউলানো (এলানো) আওড়ানো আওটানো আইসা আঁকা আঁকড়ানো আঁচানো (আচমন; আঁচ দেওয়া) আঁচ্‌ড়ানো (আকর্ষণ) আগ্‌লানো আছ্‌ড়ানো আজ্জানো আঁটা আট্‌কানো আঁৎকানো (আতঙ্কন) আনা (আনয়ন) আওসানো (ভেজিয়ে দেওয়া) আম্‌লানো (টকে যাওয়া এবং নির্বীর্য ও মৃতপ্রায় হওয়া) আদ্‌রানো আঙ্‌লানো (অঙ্গুলিদ্বারা নাড়া) আব্‌জানো (ভেজিয়া দেওয়া।— নদীয়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ব্যবহৃত) আজানো আজ্‌ড়ানো (কোনো পাদার্থ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা)।

ই

ইঁটানো (ইঁটদ্বারা আঘাত করা)।

উ

উগ্‌রোনো (উদগীরণ) উঁচোনো (উচ্চারণ) উঠা (উত্থান) উৎরনো (উত্তরণ) উথ্‌লনো (উচ্ছলিত) উপ্‌ড়নো (উৎপাটন) উব্‌চোনো উল্‌সনো (উল্লসন) উল্‌টনো (উল্লুণ্ঠন) উস্‌কনো উট্‌কনো উঙ্গোনো (ভাজিবার সময় নাড়াচাড়া করা) উলোনো (নামিয়া দেওয়া) উখ্‌ড়ানো (উলটে পালটে দেওয়া) উজ্‌ড়ানো (নিঃশেষ করা) উজানো (নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়া) উনানো (গালানো, তরল করা) উবা (উবে যাওয়া)।

এ

এগোনো এড়ানো এলানো এলা (ধান এলে দেওয়া) এলে দেওয়া।

ও

ওলা ওপ্‌ড়ানো ওড়া বা উড়া ওঠানো ওৎকানো ওল্‌টানো ওস্‌কানো ওট্‌কানো ওব্‌চানো ওথ্‌লানো ওঁচানো ওগ্‌রানো ওখ্‌ড়ানো।

ক

ককানো (কেঁদে ককানো) কমা কসা করা কহা কচ্‌লানো কড়্‌কানো কটিয়ে য়াওয়া (যথা কটা, চুল কটিয়ে যাওয়া) কখ্‌চানো কব্‌লানো কাচা (কাপড় কাচা) কাটা কাড়া কাঁড়নো (ধান কাঁড়ানো) কাঁদা (ক্রন্দন) কাঁপা (কম্পন) কাৎরানো কাম্‌ড়ানো কামানো (কর্ম) কাশা (কাশ) কিলোনো (কিল) কোঁচানো (কুঞ্চন) কোটা (কুট্টন) কুড়নো কুলনো কোপানো কোঁকড়ানো কোঁচকানো কোঁতানো (কুন্থন) কোঁদা কেনা কোড়ানো কেলানো কচানো (নূতন পত্রোদগম হওয়া) কলানো (অঙ্কুরিত হওয়া) কড়মড়ানো (কড়মড় শব্দ করা) কৎলানো (ধৌত করা) কন্‌কনানো (বেদনা করা) কোঁৎকানো (লাঠি ইত্যাদিদ্বারা আঘাত) কাব্‌রানো (কাবার অর্থ্যাৎ শেষ করা) কুচোনো (কুচি কুচি করা) কাঁচানো (একবার পূর্ণতা বা পরিপক্কতা লাভ করিয়া পুনঃ অপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া—পাশাখেলার ঘুঁটি কাঁচানো) কোদ্‌লানো (কোদালদ্বারা কোপানো) কাছানো (কাছে আসা) কালানো (শীতে হাত পা কালিয়ে যাওয়া—অবশ হওয়া)

খ

খতানো খসা খটা খাওয়া খাম্‌চানো খাব্‌লানো খিচোনো (আক্ষেপ) খিচ্‌ড়ানো খেঁকানো খোঁচানো খোঁজা খোঁটা খোঁড়া (খনন) খোদা খলা খেদানো খেপা (ক্ষিপ্ত) খেলা খেঁচকানো খাপানো (কার্যে ব্যবহৃত করা) খরানো (তাপসংযোগে ঝল্‌সে যাওয়া) খিলানো (খিলান arch নির্মান করা) খোঁড়ানো (খঞ্জ) খোঁসড়ানো বা খুঁসড়ানো বা খুঁোসা।

গ

গগানো (মুমূর্ষ অবস্থায়) গছানো (গচ্ছিত) গড়া (গঠন) গড়ানো (গলিত; শয়ন) গতানো (গমিত) গজানো গলা (গলন) গর্জানো (গর্জন) গাওয়া (গান গাওয়া) গাদানো (ঠেসে দেওয়া) গালানো গেলা (গিলন) গোঁগানো গোংরানো (গোঁ গোঁ শব্দ করা) গোঁয়ানো গোছানো গোঁজা বা গোঁজ্‌ড়ানো গোটানো গোঁতানো গোনা (গণন) গোনানো (গুনিয়ে দেওয়া) গোলা গুম্‌রোনো গুঁতোনো গুলোনো গুছোনো গুটোনো গাঁজানো বা গেঁজানো (fermented হওয়া) গাবানো (স্পর্ধা প্রচার করা ; পুষ্করিণীর জল নষ্ট করা) গুঁড়ানো (গুঁড়া বা চূর্ণ করা)।

ঘ

ঘটা (ঘটন) ঘনানো ঘব্‌ড়ানো ঘসা (ঘর্ষন) ঘস্‌ড়ানো বা ঘস্‌টানো ঘাঁটা ঘেরা ঘেঁসা ঘোচা ঘোঁটা ঘোরা ঘোলানো ঘুমানো ঘুসানো ঘুস্‌টানো ঘুরানো ঘাড়ানো (ঘাড়ে দায়িত্বগ্রহণ করা) ঘেঁঙানো (কাতরোক্তি করা) ঘেঁতানো।

চ

চর্চা চড়া চলা চরা চসা চট্‌কানো চড়ানো (চড় মারা ; উচ্চ করা বা উচ্চ স্থানে রাখা) চল্‌কানো চম্‌কানো চাখা চাগা (উত্তেজিত হওয়া) চাঁচা চাট চাপা চারানো চালানো চাপ্‌ড়ানো চেতানো চেনা চিবোনো চেরা চিরোনো চোকানো চোখানো (তীক্ষ্ণ করা) চেঁচানো চোটানো চোবানো (নিমজ্জিত করা) চোরানো চোষা চোনা (চুনে লওয়া) চোপ্‌সানো চান্‌কানো (প্রতিমা ও পুত্তলিকা প্রভৃতির চক্ষু অঙ্কন করা, কৃষ্ণনগর অঞ্চলে গ্রাম্য চিত্রকরের মধ্যে ব্যবহৃত) চিম্‌টানো (চিম্‌টি কাটা ; রসহীন হওয়া) চেপ্‌টানো (চেপটা করা) চিক্‌রানো (চেঁচানো) চোপানো (অস্ত্রদ্বারা থোড়া)।

ছ

ছকা (ছক্‌ কাটা) ছড়ানো ছাঁকা ছাঁটা ছাড়া ছাঁদা ছানা (ছেনে লওয়া) ছাওয়া ছেঁড়া ছেঁচা ছটানো ছোঁচানো (শৌচ) ছোটা ছোঁড়া ছোলা (ছুলে দেওয়া) ছোঁয়া ছোব্‌লানো ছিটোনো ছুটোনো ছোটানো ছিট্‌কানো বা ছট্‌কানো ছাপানো (ছাপ দেওয়া ; ছাপিয়ে উঠা) ছেঁচ্‌ড়ানো (ঘর্ষণ সহকারে টানিয়া লওয়া) ছোবানো বা ছোপানো (রঞ্জিত করা)।

জ

জড়ানো জপা জমা জম্‌কানো জ্বলা জ্বরা জাঁকা (জাঁকিয়ে উঠা) জারা (জারণ) জানা জ্বালা জেতা জোটা জোতা জোড়া জ্যাব্‌ড়ানো জিয়োনো জিরোনো জুতোনো জুটনো জুড়ানো জুয়োনো জল্‌শনো জবানো (জবাই করা) জাগা জাওরানো (রোমন্থন করা)।

ঝ

ঝরা ঝল্‌সানো ঝাঁকানো (অধ্যাকম্পন) ঝাঁক্‌রানো ঝাঁটানো ঝাড়া ঝাঁপা ঝাম্‌রানো (অধ্যামর্ষণ) ঝালানো (অধ্যালেপন) ঝাঁকা ঝোলা ঝিমনো ঝট্‌কানো (অস্ত্রের আঘাতে দ্বিধা করা) ঝাঁজানো (তীব্রতা উৎপাদন)।

ট

টকা (টকিয়া যাওয়া) টলা টপ্‌কানো টহলানো টস্‌কানো টানা টাকা টেপা টোকা টুটা টেঁকা টোয়ানো (টুইয়ে দেওয়া) টিকনো টোপানো (বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া) টাটানো (ব্যথা করা) টাউরানো (শীতে শরীর টাউরে যাওয়া, অবশ হওয়া) টোকা (note করা)।

ঠ

ঠকা ঠাসা ঠাওরানো ঠেকা ঠেলা ঠেসা ঠেঙানো ঠোকা ঠোকরানো ঠোসা।

ড

ডলা ডরানো ডাকা ডোক্‌রানো ডোবা ডিঙনো ডালানো (গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়া)।

ঢ

ঢাকা ঢালা ঢিলোনো ঢ্যালানো ঢিপোনো ঢিকোনো ঢোকা ঢোলা ঢোঁসানো ঢুকোনো ঢ্যাকানো (ধাক্কা দেওয়া) ঢল্‌কানো (কোনো তরল পদার্থ ঢালিয়া ফেলা এবং তাহাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিকে লইয়া যাওয়া)।

ত

তরা (তরে যাওয়া) তলানো তড়বড়ানো তাকানো তাড়ানো তাংড়ানো তাসানো তোব্‌ড়ানো তোলা তোড়া (তুড়ে দেওয়া) তোত্‌লানো তাতানো (উত্তপ্ত করা)।

থ

থতা (থতিয়া যাওয়া) থাকা থামা থম্‌কানো থাব্‌ড়ানো থোড়া (থুড়িয়ে দেওয়া) থিতোনো থোয়া থেঁত্‌লানো থাড়ানো (to make erect) থেব্‌ড়ানো (কোমল পদার্থে চাপ দিয়া চেপটা করা)।

দ

দমানো (বলপ্রয়োগে নত করা) দাঁড়ানো দাঁতানো (দাঁত বহির্গমন হওয়া) দাপানো (হস্তপদাদি আস্ফালন করা) দাব্‌ড়ানো দাবানো (দমানো) দোলানো দেওয়া দেখা দোষানো (দোষ প্রদর্শন) দৌড়ানো দড়বাড়ানো দপ্‌দপানো দোয়ানো (দোহন করা)দোম্‌ড়ানো।

ধ

ধরা ধসা ধাওয়া ধোয়া ধোয়ানো ধোনা (তুলা ধোনা, অর্থাৎ তাহার আঁশগুলা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা)।

ন

নড়া নাচা নাড়া নাওয়া নাবা বা নামা নাদা নেতানো (নেতিয়ে পড়া) নেলানো নেংড়ানো নিড়োনো নিকোনো নোওয়া নিছোনো নিবোনো নেবা নেটানো (ছেঁচ্‌ড়ে লইয়া যাওয়া ; সংস্পর্শে আনা) নলানো (খেঁজুরগাছ হতে রস গ্রহণজন্য গাছে নল সংযুক্ত করা)।

প

পচা পটানো পড়া পড়া (পাঠ-কৃ) পরা পালানো পশা পাকা পাকানো পাওয়া পাঠানো পাড়া পানানো (গোরু পানিয়ে যাওয়া) পেঁচানো পোঁচানো পোঁছা পোড়া পোঁতা পোওয়ানো পোরা পোষা পেশা (পুঁজিয়ে বা পূরণ করিয়া পুজান দেওয়া) পেটানো পিছনো পিটোনো পিল্‌কানো পাক্‌ড়ানো পট্‌কানো পারা পাশানো (পাশ দেওয়া তাস-খেলায়) পেঁজা বা পিঁজা (তুলা প্রভৃতির আঁশ পৃথক করা) পিচ্‌লানো পিট্‌পিটানো (চক্ষু পিটপিট করা)।

ফ

ফলা ফস্‌কানো ফাটা ফাড়া ফাঁদা ফাঁসা ফিরানো ফুক্‌রোনো ফুলোনো ফুরোনো ফুটোনো ফুঁপোনো ফেলা ফেটানো ফেরা ফোঁকা ফোলা ফোটা ফোঁসানো ফোক্‌রোনো ফাঁপা ফেক্‌রোনো (হঠাৎ রাগাদি-প্রযুক্ত চলিয়া যাওয়া) ফেনানো (ফেনাযুক্ত করা) ফোঁড়া (বিদীর্ণ করা) ফুসানো : ফুস্‌লানো (কুপরামর্শ গোপনে দেওয়া)।

ব

বহা বকা বখানো (বখিয়া দেওয়া) বধা বনা বওয়া বদ্‌লানো বলা বসা বাঁকানো বাগানো বাঁচা বাচানো (বাচিয়ে দেওয়া) বাছা বাজা বাঁধা বানানো (তৈয়ার করা) বাড়া বাওয়া বেছানো বেড়ানো বিওনো বিকোনো বিগ্‌ড়ানো বিননো বিলানো বিষানো (বিষাক্ত হওয়া) বেচা বেলা (রুটি বেলা) বুঁচোনো বুজোনো বুঝোনো বুড়োনো বুনোনো বুলানো বোঁচানো বোজা বোঝা বোড়ানো বোনা বোলানো বেড়ানো বেতানো (বেতদ্বারা মারা) বাত্‌লানো বিঁধোনো।

ভ

ভজা ভরা ভড়্কানো ভাগা ভাঙা ভাজা ভাঁড়ানো ভাঁটানো (ভাঁটি য়ে দেওয়া) ভানা ভাপানো ভাবা ভাসা ভিজোনো ভিড়োনো ভুগোনো ভুলোনো ভেঙানো বা ভেঙচানো ভেজানো (বন্ধ করা) ভেপ্সানো ভেজানো (আর্দ্র করা) ভোগানো ভোলানো ভিয়ানো (মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা) ভাঁড়ানো (ভাঁড়ামি করা ; প্রতারণা করা) ভাব্ড়ানো (অকৃতকার্যতা-নিবন্ধন চিন্তা করা) ভ্যাকানো।

ম

মচ্কানো মজানো মওয়া (মন্থন করা) মরা মলা (মর্দন করা) মাখা মাঙা মাজা মাড়া মাতা মানা (মান্য করা) মাপা মারা মিটোনো মিওনো মিলোনো মিশোনো মুখোনো (মুখিয়ে থাকা) মুড়োনো মুতোনো মেটানো মেলানো মেশানো মোটানো মোড়ানো মোতা মোদা মোছা মোস্ড়ানো (হতাশ্বাস হওয়া) মস্টানো (ময়দা মস্টানো)।

য

যাচা যাওয়া যাঁতানো।

র

রগ্ড়ানো রঙানো রচা রটা রওয়া রসা রাখা রাগা রাঙানো রুচোনো রোখা রোচা রোপা রোওয়া।

ল

লড়া লতানো লওয়া লাফানো লুকোনো লুটোনো লেখা লেপা লোটা লোঠা লাঠানো (লাঠিদ্বারা প্রহার করা) লুফা বা লোফা (শূন্য হইতে পথে কোনো পদার্থকে ধরা)।

শ

শাসানো শিসনো শোষা শেখা শিখোনো শিউরোনো শোওয়া শুকোনো শোধ্রানো শোনা শাপানো (অভিসম্পাত করা) শিঙোনো (প্রথম শৃঙ্গোদগম হওয়া)।

স

সট্কানো সঁপা সওয়া সরা সাজা সাধা সাম্লানো সাঁৎরানো সাঁৎলানো সানানো সারানো সিটকানো সুধানো সেঁকা সেঁচা সেঁধানো (প্রবেশ করা) সোঁকা সোল্কানো সাঁটানো সাপানো (সর্প-কর্তৃক দংশিত হওয়া) সারানো।

হ

হটা হওয়া হাঁকা হাগা হাঁচা হাজা হাঁট্‌কানো হাতানো হাৎড়ানো হাঁপানো হারা হাসা হেদোনো হেলা হেরা হ্যাঁচ্‌কানো (হঠাৎ জোরে টানা)।

ক্ষ

ক্ষওয়া ক্ষরা ক্ষেপানো (ক্ষিপ্ত করা) ক্ষুরোনো (প্রসবকালীন গোবৎসের প্রথম ক্ষুর নির্গমন)।